প্রথম বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ আষাঢ় ॥ ১৩৮২

আনন্দমেলা

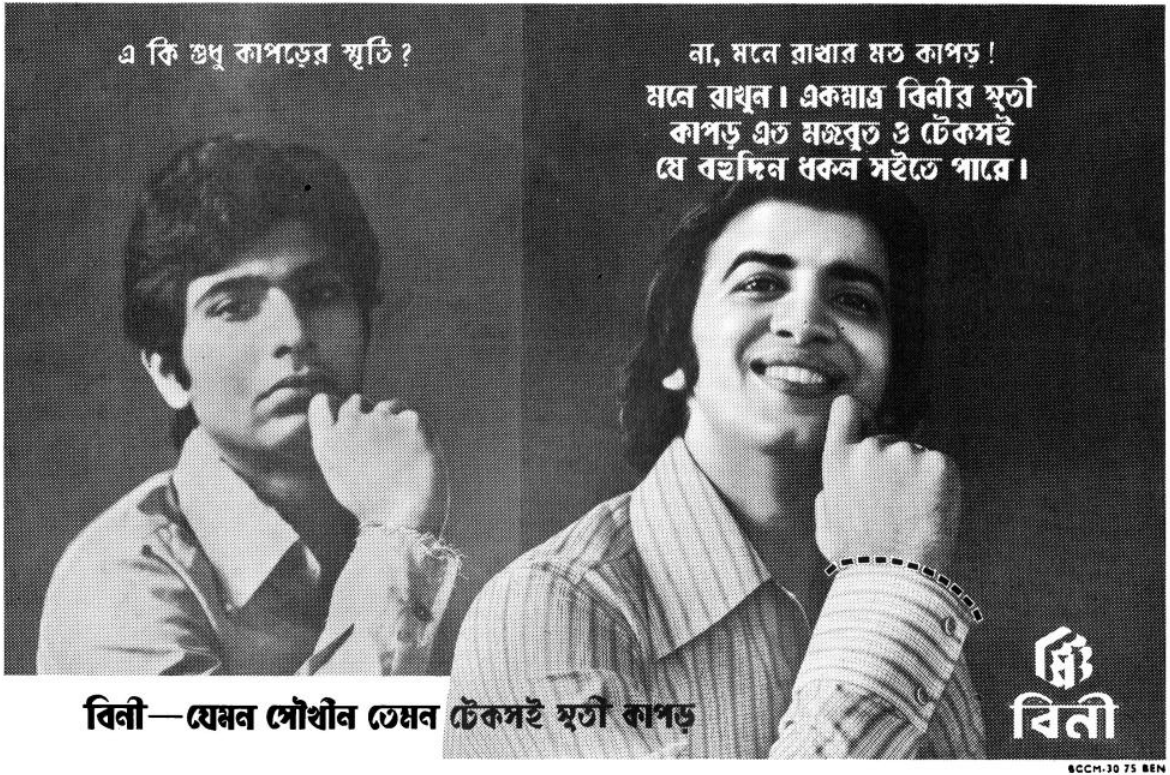

BCCM-30 75 BEN

আনন্দমেলা

প্রথম বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা
আষাঢ় ॥ ১৩৮২
দেড় টাকা

ছড়া/ অমিতাভ চৌধুরী। ৪
জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। ৪৪

উপন্যাস/ কাপালিকরা এখনো আছে। বিমল কর। ৩৪
রাজা হওয়ার ঝকমারি। বিমল মিত্র। ৪০

উপকথা ও গল্প/ ভারতযুদ্ধে পিঁপড়ে। প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১২
ডোডো তাতাই পালা কাহিনী। তারাপদ রায়। ১৭
গোয়েন্দার নাম গোগো। গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু। ২৩
কালো বেড়ালের গুপ্তধন। শৈলেন ঘোষ। ৩১
মাকড়শা। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ৪৮
মনুকাহিনী। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী। ৮

কমিকস/ টিনটিন। কাঁকড়া রহস্য ৬, ৭, ১০, ১১
টার্জান। ৪৬, ৪৭, ৫০, ৫১

বিজ্ঞান, জীবনী ও প্রবন্ধ/ মুক্তার জন্মকাহিনী। দুলেন্দ্র ভৌমিক। ২০
হাতি দিয়ে হাতি ধরা। অভ্র রায়। ৫৩
অঙ্কের মজা, মজার অঙ্ক। শুভঙ্কর। ২৯

নিয়মিত বিভাগ/ ম্যাজিক। পি. সি. সরকার জুনিয়র। ৩৯
ম্যাজিকের মতো। পার্থসারথি চক্রবর্তী। ৩৮
আজব চিড়িয়াখানা। বহুরূপী। ৪৫
যাদুঘর। শ্রীপান্থ। ২২
ধাঁধার পাতা। সত্যসন্ধ। আচ্ছা বলতো। ৫
জানা না-জানা। ১৬, ২৮
রাজায় রাজায়। দিগদর্শক। ৩০
বিন্দু বিসর্গ। ইন্দ্রমিত্র। ৫৪

তোমাদের পাতা/ ছেলেধরা। মঞ্জরী চৌধুরী। ৫২
শেয়াল-ভাগ্নে। সুস্মিতা ঘোষ। ৫২

প্রচ্ছদ/ কুশল চক্রবর্তী

রঙীন ফটো/ হাতিধরা। তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি. আই. টি. রোড, কলিকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
পূর্বাঞ্চলে বিমানের জন্য অতিরিক্ত মাশুল ১৫ পয়সা

ছড়া

অমিতাভ চৌধুরী

ছবি এঁকেছেন ॥ পূর্ণেন্দু পত্রী

আগারাম বাগারাম তুলপুলে বাঘারাম
বঙ্গাল দেশ থেকে বোমবাই ভাগারাম।
ছেড়ে লোহালক্কড়
দেশ জুড়ে চক্কর—
লখনউ গৌহাটি মিজোরাম নাগারাম

২

মিনাবাজার মিনাবাজার
চলবে না আর বিনা-বাজার।
জারি হৈল নতুন আইন
বাসের পথ ট্রামের লাইন,
পগেয়াপটি চীনাবাজার—
সবই এখন মিনাবাজার।

৩

ডানকুনি থানকুনি ডানকুনি জং
সেইখানে লোকোশেডে আছে কিংকং।
মিশকালো চেহারায় জব্বর জং,
হুস্ করে ছুটে এল রেগেমেগে টং—
হাওড়ার কোণাকুণি ডানকুনি জং।

ধাঁধার পাতা

সেদিন চিলেকোঠায় ছোট্‌কার মেজাজ দেখে একটু ভরসা পেলাম। বললাম, "ধাঁধা তো চাই-ই। তার আগে একটা কথা বলো তো ছোট্‌কা। সেই যে তুমি খাতায় একটা ছড়া লিখে রেখেছিলে না—

দ্বন্দ্ব ছিল, ধন্ধ হল, ধন্ধ
থেকে ধাঁধা,
উপাধ্যায়ের কাছে যেমন ওঝার
টিকি বাঁধা।

এই ছড়াটার কি কোনো মানে নেই? এটা কি হিজিবিজি ছড়া? নাকি নতুন ধাঁধা? এর উত্তর তো তুমি লেখোনি।"

শুনে ছোট্‌কার সে কী হাসি। যাকে বলে অট্টহাসি আর কী। হাসি থামলে বলল, "এটা ধাঁধা কেন হবে? বোকা কোথাকার। এটা তো ধাঁধার উত্তর। পিওর ব্যাকরণ। ভাষাতত্ত্ব। নো হিজিবিজি বিজনেস।"

"তার মানে?"

"তার মানে তাই। তোকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম না, দ্বন্দ্ব থেকে কী করে ধাঁধা হল, এটা তারই উত্তর। আমাদের বাংলায় অধিকাংশ শব্দই এসেছে সংস্কৃত থেকে। যেমন ছিল, হুবহু তেমনভাবে এসেছে কিছু শব্দ। কিছু-বা আসতে-আসতে বদলে গিয়েছে। দ্বন্দ্ব = ধন্ধ = ধাঁধা। উপাধ্যায় = ওঝা।

এক মজার ভাষা শোনাই। এ-ভাষার নাম বুগবুলবুলি ভাষা।"

"বুগবুলবুলি ভাষা! সে আবার কী ছোট্‌কা।"

"হ্যাঁ, বুগবুলবুলি। সাধু বাংলায় এর নাম ডুন্ডুম্মানিত ভাষা। একটা উদাহরণ শোনাই। লিখে নে বরং।"

ছোট্‌কা বলে গেল। আমি হোঁচট খেতে খেতে লিখতে লাগলাম— "সম্মম্‌মরাট সমুদ্রগুপ্তের রেম্ফটাকুন্ট ত্বরিৎত্রম্যান্ত পর্যুগাসম উপ্রংসিত নিরংকরালের সহিত অজাতশত্রু অপরিপর্যস্মিত গর্গরায়ণকে পরমন্তি শয়নে সমুসদ্‌গারিত করিয়াছিল।"

"কী মাথার মধ্যে 'তাজ্‌ঝিম মাজঝিম্‌' করছে তো?" ছোটকা বলে চলল, "এবারের **প্রথম ধাঁধা** এই দিয়েই আরম্ভ। এই ভাষা যাঁর মুখের সেই চরিত্রের নাম কী, কোন্ গল্প থেকে চরিত্রটি নেওয়া, গল্পটি কার লেখা?"

দ্বিতীয় ধাঁধা: কোন্ ফল ওলটালে মজা পাওয়া যায়? মুখ গুঁজে কোন্ ফল রয়েছে লতায়?

তৃতীয় ধাঁধা: ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০—এই দশটি সংখ্যা এমন ভাবে সাজাতে হবে যাতে উত্তর হয় ১। (ভগ্নাংশ চলবে)।

চতুর্থ ধাঁধা: ১০টি সমান আকারের থলে। প্রতিটি থলেতে ১০টি করে বাটখারা, একরকম দেখতে। ৯টি থলের প্রতিটি বাটখারার ওজন ১ কেজি। কিন্তু একটি থলের বাটখারার ওজন প্রত্যেকটি ১১০০ গ্রাম। একটি নিখুঁত দাঁড়িপাল্লায় একবার মাত্র ওজন করে কীভাবে বার করা সম্ভব কোন্ থলেতে বেশী-ওজনের বাটখারাগুলো রয়েছে?

গতবারের ধাঁধার উত্তর। পিক। ওলটালে কপি। মানে শাখামৃগ বা বাঁদর।

দ্বিতীয় ধাঁধা: আটখানা আটে হাজার বানানো। উত্তর—৮৮৮+৮৮+৮+৮+৮=১০০০।

তৃতীয় ধাঁধা: চারটি ১ দিয়ে সর্ব-বৃহৎ সংখ্যা কিন্তু ১১১১ নয়। এর বহু বহু গুণ বেশী সংখ্যা $১১^{১১}$ এই ভাবে সাজালে পাওয়া যায়। উত্তর কত জান? ২৮৫৩১,১৬৭০,৬১১। (১১×১১×১১×১১ এইভাবে এগারবার করে দেখো)।

চতুর্থ ধাঁধা: (ক) সাতখানা টব তিন সারিতে নানাভাবে সাজানো যায়—যাতে প্রত্যেক সারিতে তিনটে করে দেখা যাবে। বনমালী সাজিয়েছিল ইংরেজী U অথবা N অথবা Z এর মতো।

(খ) বিরিঞ্চিবাবু ছ-খানা টবে ন-খানার মতো সাজাতেন। তা সম্ভব, এইভাবে সাজালে—

—সত্যসন্ধ

ক

খ

আচ্ছা বল তো

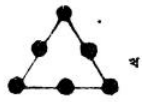

প্রঃ দু-অক্ষরে এমন একটা কথা বল যার উচ্চারণ কখনো ঠিক হয় না।

উঃ ভুল।

প্রঃ লোহিত সাগরের জলে যদি একটা নীল সুতি জামা ফেলে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে?

উঃ জামাটা ভিজে যাবে।

প্রঃ কোন বাস আটলাণ্টিক সমুদ্র পেরিয়েছিল?

উঃ কলম্বাস।

প্রঃ অস্ট্রেলিয়া আবিস্কার হবার আগে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় দ্বীপ কোনটা ছিল?

উঃ অস্ট্রেলিয়া।

প্রঃ সিমলা চুক্তি কোথায় সই হয়েছিল?

উঃ কাগজের একেবারে তলার দিকে।

প্রঃ কোন মাছের এক কান থেকে আর এক কানের দূরত্ব সবচেয়ে বেশি?

উঃ সবচেয়ে বড় মাছের।

প্রঃ ভদ্রলোক সোমবারে দীঘা গেলেন, এক রাত থাকলেন, পরের দিন ফিরলেন, কিন্তু সোমবারেই। কি করে?

উঃ উনি যে বাসে গিয়েছিলেন তার নাম সোমবার।

প্রঃ একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ—তিনে আর চারে কি?

উঃ সাত।

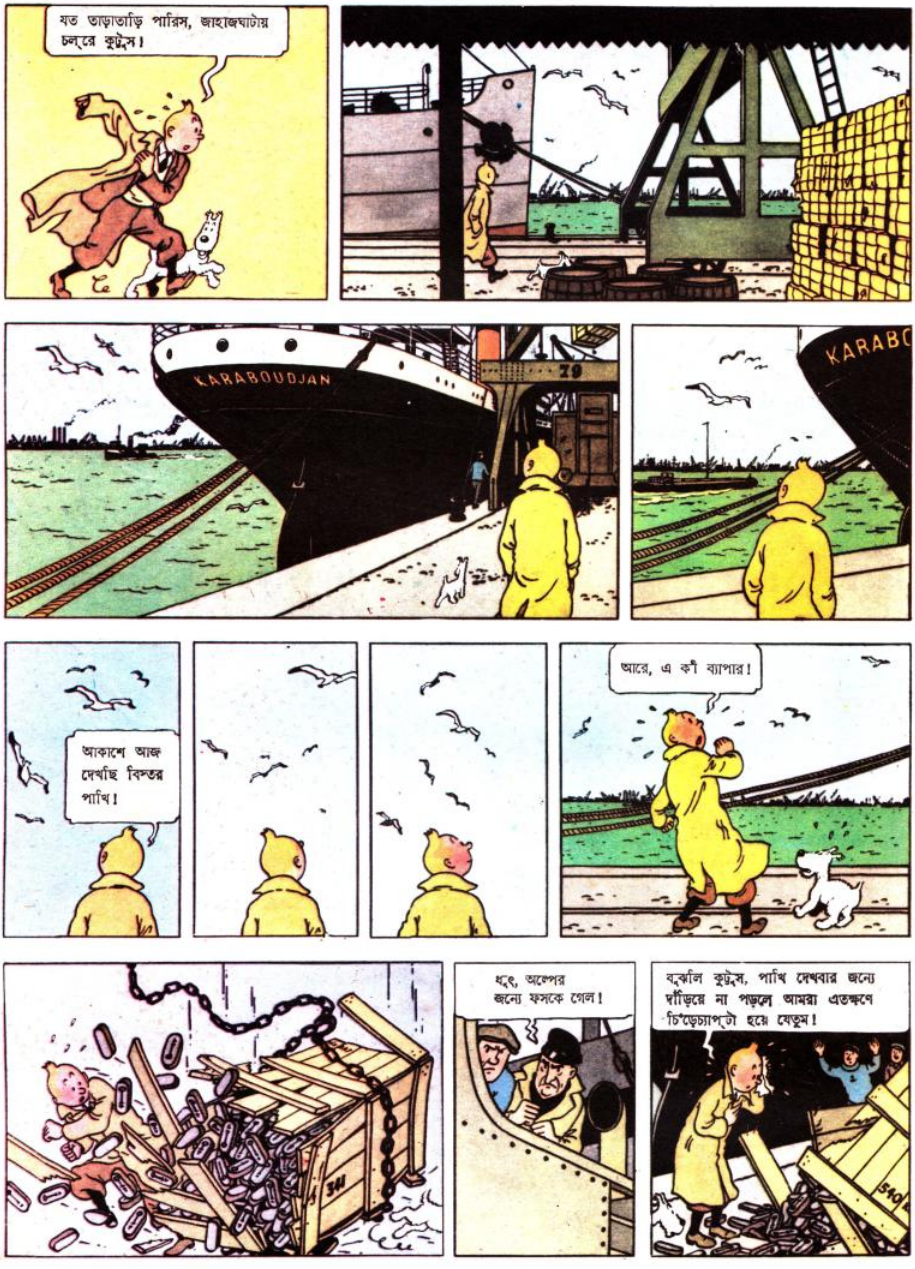
যত তাড়াতাড়ি পারিস, জাহাজঘাটায় চল্‌রে কুট্টস।
KARABOUDJAN
79
KARABO
আকাশে আজ দেখছি বিস্তর পাখি!
আরে, এ কী ব্যাপার!
ধুৎ, অল্পের জন্যে ফসকে গেল!
বুঝলি কুট্টস, পাখি দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে না পড়লে আমরা এতক্ষণে চিঁড়েচ্যাপ্‌টা হয়ে যেতুম!

ব্যাপার কী?
আর বলেন কেন, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি! কিন্তু আপনারা হঠাৎ এখানে?
শেকল ছিঁড়ে গিয়েছিল।
যে মাল্লাটি মারা গেছে, তার সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্যে আমরা কায়রোজান জাহাজে উঠব।
তাই নাকি? চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।
কতক্ষণ জাহাজে থাকবেন?
তা এই আধ ঘণ্টাটাক।
দুই গোয়েন্দার সঙ্গে সেই ছেলেটাও আসছে!
আমি ওদের সঙ্গে কথা বলছি। তুমি ওর ব্যবস্থা করো। কিছুতেই যেন জাহাজ থেকে ফিরতে না পারে।
বুঝেছি!
আধ ঘণ্টা বাদে ঠিক এইখানে আমি আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব।
তা বেশ তো!
আপনিই এই জাহাজের মেট? বেশ, বেশ। তা আমরা সেই মাল্লাটির ব্যাপারে খোঁজখবর করতে এসেছি।
বেশ তো, আমার কেবিনে আসুন, নিরিবিলিতে কথা বলা যাবে।
চোকাঠের দিকে নজর রাখবেন.....
বড্ড উঁচু...
আহাহাহা, ধাক্কা লাগল?
৭
এরপর দশের পাতায়

পুরাণের গল্প

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

মনু

তুমি কে?

—আমি মানব।

কোথায় তোমার জন্ম?

—কর্মভূমি ভারতবর্ষে।

কি তোমার ধর্ম?

—মানবধর্ম।

মানুষ পশু নয়, দেবতাও নয়। মানুষ মানুষ। তার কতকগুলি ধর্ম আছে, যে সকল গুণে একটি মানুষ সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠে, তাই মানবধর্ম।

আমাদের দেশে এই ধর্ম যিনি প্রথম শিখিয়েছিলেন, পুরাণে তাঁকে বলা হয় মনু। এই মনুই আদি মানব পিতা।

পিতা বলতে আমরা জন্মদাতা জনককেই বুঝি। আসল পিতা শুধু জনক নন। যিনি পালন করেন, তিনিই পিতা। পিতা সন্তানকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন, দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। তিনি শিখিয়ে দেন জীবনে চলার নিয়ম। সন্তানকে গড়ে তোলেন সুন্দর ও মঙ্গলের আদর্শে। এই অর্থেই মনু আদি পিতা।

মনু একজন নন, অনেক। পুরাণে চোদ্দজন মনুর নাম পাওয়া যায়। স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তম, তামন, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, পঞ্চসাবর্ণি (সাবর্ণি দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম-সাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি) এবং রৌচ্য ও ভৌত্য। এঁদের ভিতর প্রথম ছয়জন মনুর কাল শেষ হয়ে গিয়েছে। তোমরা আছ সপ্তম বৈবস্বত মনুর অধিকারে। এঁর পরেও এই কল্পে পরবর্তী সাতজন মনু রাজত্ব করবেন।

কল্পে কল্পে মনুরা আসেন, পৃথিবী পালন করেন, লোকশিক্ষা দেন। প্রজাপতি ব্রহ্মার এক দিনে এক কল্প। সে কল্পকালের পরিমাণ করা মানুষের অসাধ্য। তোমরা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চার যুগের কথা জান। ব্রহ্মার এক কল্পে এমনি বহু চতুর্যুগ ঘুরে ফিরে আসে। এই সময়ের মধ্যে চোদ্দজন মনু একে একে রাজত্ব করেন।

সাধারণত এক মনুর অধিকার-কালকে বলা হয় মন্বন্তর। কিন্তু তোমরা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ বা মড়ক হলেই বল মন্বন্তর। যেমন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। পঞ্চাশের মন্বন্তর। তখন অনেক গ্রাম, নগর ধ্বংস হয়ে যায়, কত লোক মারা যায়। যেন খণ্ড প্রলয়। তখন নিয়ম থাকে না। মানুষ নীতি ভুলে যায়, ভুলে যায় মানুষের ধর্ম। দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা সব গ্রাস করে মন্বন্তর।

মন্বন্তরের অবসানে আসেন নতুন মনু। তিনি শাসনভার হাতে নেন। দুষ্টের দমন করেন, করেন শিষ্টের পালন। তখন আবার শান্তি ফিরে আসে। মনু নতুন করে মানবের কাছে তুলে ধরেন মানবধর্ম। বলেন, মানুষ তুমি এই পথে চল, এই কাজ কর। তুমি মানুষ; খাঁটি মানুষ হও। সুন্দর হও, সৃষ্টিকে সুন্দর কর।

আদি মনুর জন্মকালের সৃষ্টিতে চলেছিল মহা বিপর্যয়। ব্রহ্মা বসেছেন ধ্যানে। তিনি সৃষ্টি করে চলেছেন। চারদিকে অন্ধকার। অন্ধকারে গর্জন করছে সপ্তসাগরের ঢেউ। চারদিকে শুধু জল আর জল, পুরাণের ভাষায় বলে 'একার্ণব'।

সহসা সেই জলে ভেসে উঠল পৃথিবী। যেন সাগরকন্যা। তার বুকে দেখা দিল পাহাড়, পর্বত। ক্রমে সবুজে ভরে উঠল শ্যাম ধরণী। সবুজ লতা, সবুজ গাছ, সবুজ অরণ্য। ভূমিরও কত না বাহার—কোথাও কাঁকর, কোথাও বালি। কোথাও মাটি লাল, কোথাও নিকষ কালো। মরু, মেরু, সাগর, পাহাড়, অরণ্য নিয়ে সে এক অপূর্ব শোভা।

কিন্তু কে ভোগ করবে এই সুন্দর ধরা?

ব্রহ্মা আবার ধ্যানে বসলেন। তাঁর মন শান্ত নয়, এলোমেলো। বাঁকা মনে বাঁকা সৃষ্টির প্রকাশ হল। সৃষ্টিতে এল—কৃমি-কীট, মৃগ-পশু। বাঘ, সিংহ গরু, ঘোড়া, কুকুর, শেয়াল, বানর—কাছিম, গাধা, সাপ—কাক, সারস, হাঁসে পৃথিবী ভরে উঠল।

ব্রহ্মা দেখলেন, এদের বিচার নেই, বুদ্ধি নেই। এরা শুধু নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। এ ওকে হিংসা করে, একে অন্যকে আহার করে। পেটের তাগিদই ওদের একমাত্র তাগিদ।

তখন ব্রহ্মার ধ্যানে প্রকাশিত হলেন দেবগণ। তাঁরা সুন্দর, সর্বাঙ্গ জ্যোতির্ময়। যেন ব্রহ্মার মনের প্রসন্নতা নিয়েই আবির্ভূত হলেন তাঁরা, সৃষ্টিতে এলেন অপ্সরা, গন্ধর্ব কিন্নর সিদ্ধ, চারণ বিদ্যাধর।

কিন্তু হঠাৎ কি হল? ওই সৃষ্টি মধ্যে অসুর, যক্ষ, রাক্ষস।

ভয় পেয়ে গেলেন সৃষ্টিকর্তা নিজে। এরা তো কেউ পৃথিবী ভোগের যোগ্য নয়। তখন প্রজাপতি ব্রহ্মার ধ্যানে প্রকট হল মানুষ।

ছবি এঁকেছেন ॥ শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

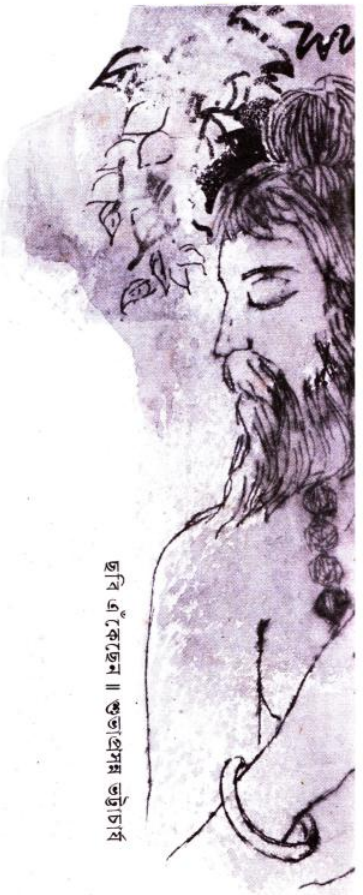

কাহিনী

আনন্দিত হলেন ব্রহ্মা। ভাবলেন, সুন্দর ধরণীকে ভোগ করুক এই মানুষ। কিন্তু তখনও মানুষের ভিতর এমন কেউ জন্মায় নি, যিনি সার্থক করে তুলবেন ব্রহ্মার সংকল্প।

দেখতে দেখতে ব্রহ্মার মন থেকে বেরিয়ে এল এক উজ্জ্বল মূর্তি। অগ্নির তেজের মত তাঁর তেজ। একই শরীরে তাঁর দুটি ভাগ। এক ভাগ পুরুষ, এক ভাগ নারী।

ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, দেহকে বিভক্ত কর পৃথক হও। চোখের পলকে সেই দেহ দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ পুরুষ। সে পুরুষের দেহে আগুনের মত দীপ্তি। চোখে-মুখে বুদ্ধির ঝলক।

আর এক ভাগ পৃথক হয়ে হল নারী। তাঁর দেহখানি যেন প্রদীপের আলো। যেন সদ্য ফোটা একটি ফুল। মুখে কোমলতা, অন্তরে মমতা।

সৃষ্টিতে উঠল আনন্দধ্বনি। গন্ধর্বেরা গান করতে লাগলেন। কিন্নরেরা বীণা যন্ত্রে তান তুললেন। অপ্সরাগণ নূপুর পায়ে নাচতে লাগলেন। দেবতারা বললেন, ধন্য ধন্য।

নতুন নারী, নতুন পুরুষ। তাঁরা হাত জোড় করে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সামনে দাঁড়ালেন।

ব্রহ্মার মনে আনন্দ। নিজের সৃষ্টি দেখে তিনি নিজেই অবাক। হাসি মুখে তিনি পুরুষকে বললেন, আমার মন থেকে তোমার জন্ম, তোমার নাম হবে মনু।

তারপর নারীটির দিকে চেয়ে সহাস্যে বললেন, জগতের প্রথমা নারী তুমি। তোমার নাম 'শতরূপা'।

সকলে হর্ষধ্বনি করে উঠল। ব্রহ্মা আবার বললেন, ভারতবর্ষে আছে এক পুণ্য দেশ। নাম তার ব্রহ্মাবর্ত। সে দেশের দুই দিকে দুই নদী—সরস্বতী ও দৃশদ্বতী। এই ভূভাগে একটি সুন্দর নগরী আছে, তার নাম বর্হিষ্মতি পুরী। তোমরা সোজা সেই পুরীতে চলে যাও। এই পুরীতেই রাজত্ব করবেন স্বায়ম্ভুব মনু।

হাঁটু গেড়ে ব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন মনু ও শতরূপা।

দূর্বাঘাস যেমন শিকড় ছড়িয়ে অনেকখানি জায়গা দখল করে, তেমনই এই বংশের লতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মনুর দুই ছেলে, তিন মেয়ে। ছেলেদের নাম প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। এই উত্তানপাদের ছেলে ধ্রুব।

স্বায়ম্ভুব মনুর ছেলে, মেয়ে ও নাতি-নাতনীর বংশলতিকায় ভুবন ভরে আছে। এদের নিয়েই গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের মানবসমাজ।

রথ প্রস্তুত হয়েই থাকত। তিনি সেই রথে চড়ে রাজ্য প্রদক্ষিণ করতেন।

দিনদেব সূর্য যেমন সাত ঘোড়ার রথে আকাশ পর্যটন করে বিশ্বের সব কিছু দেখেন, আদি রাজা মনুও তেমনই সপ্তাশ্ববাহিত রথে ভূ-পর্যটন করতেন। তাঁর চক্ষু যেন সূর্যচক্ষু।

ধর্মের সঙ্গে কর্ম, ভোগের সঙ্গে ত্যাগকে এক স্বর্ণশৃঙ্খলে বেঁধেছিলেন আদি রাজা মনু। তিনিই ভারতবাসীকে শিখিয়েছিলেন, কেমন করে গৃহী গৃহধর্ম পালন করবে, কেমন করে রাজা পালন করবেন রাজধর্ম।

এইভাবেই সকলের আনন্দ বর্ধন করে শেষ বয়সে পুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়ে বনবাসী হয়েছিলেন রাজা মনু।

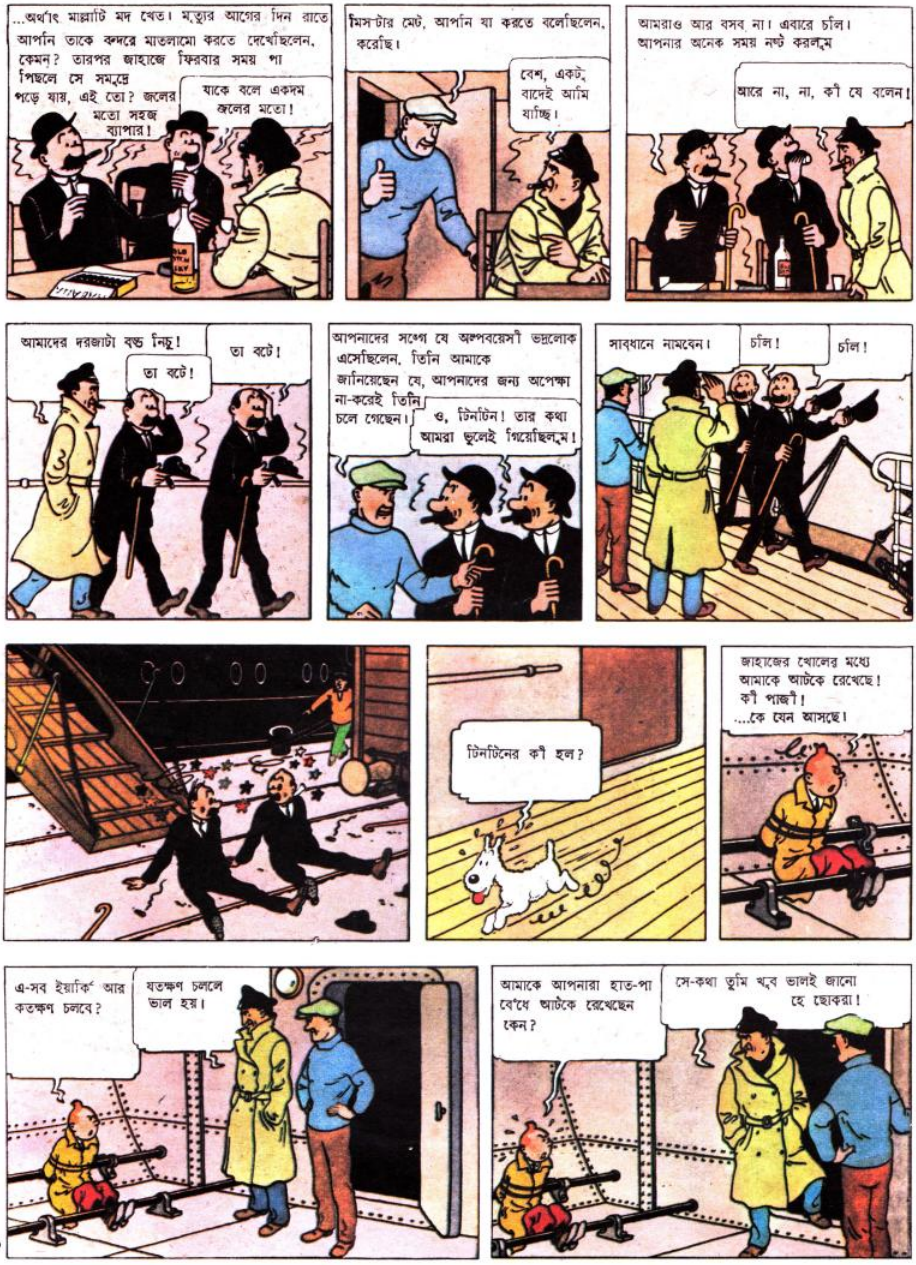
...অর্থাৎ মাল্ল্যাট মদ খেত। মৃত্যুর আগের দিন রাতে আপনি তাকে কদরে মাতলামো করতে দেখেছিলেন, কেমন? তারপর জাহাজে ফিরবার সময় পা পিছলে সে সমুদ্রে পড়ে যায়, এই তো? জলের মতো সহজ ব্যাপার!
যাকে বলে একদম জলের মতো!
মিস্টার মেট, আপনি যা করতে বলেছিলেন, করেছি।
বেশ, একটু বাদেই আমি যাচ্ছি।
আমরাও আর বসব না। এবারে চলি। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলুম
আরে না, না, কী যে বলেন!
আমাদের দরজাটা বন্ধ নিচু!
তা বটে!
তা বটে!
আপনাদের সঙ্গে যে অল্পবয়েসী ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, আপনাদের জন্য অপেক্ষা না-করেই তিনি চলে গেছেন।
ও, টিনটিন! তার কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলুম!
সাবধানে নামবেন।
চলি!
চলি!
টিনটিনের কী হল?
জাহাজের খোলের মধ্যে আমাকে আটকে রেখেছে! কী পাজী! ....কে যেন আসছে।
এ-সব ইয়ার্কি আর কতক্ষণ চলবে?
যতক্ষণ চললে ভাল হয়।
আমাকে আপনারা হাত-পা বেঁধে আটকে রেখেছেন কেন?
সে-কথা তুমি খুব ভালই জানো হে ছোকরা!

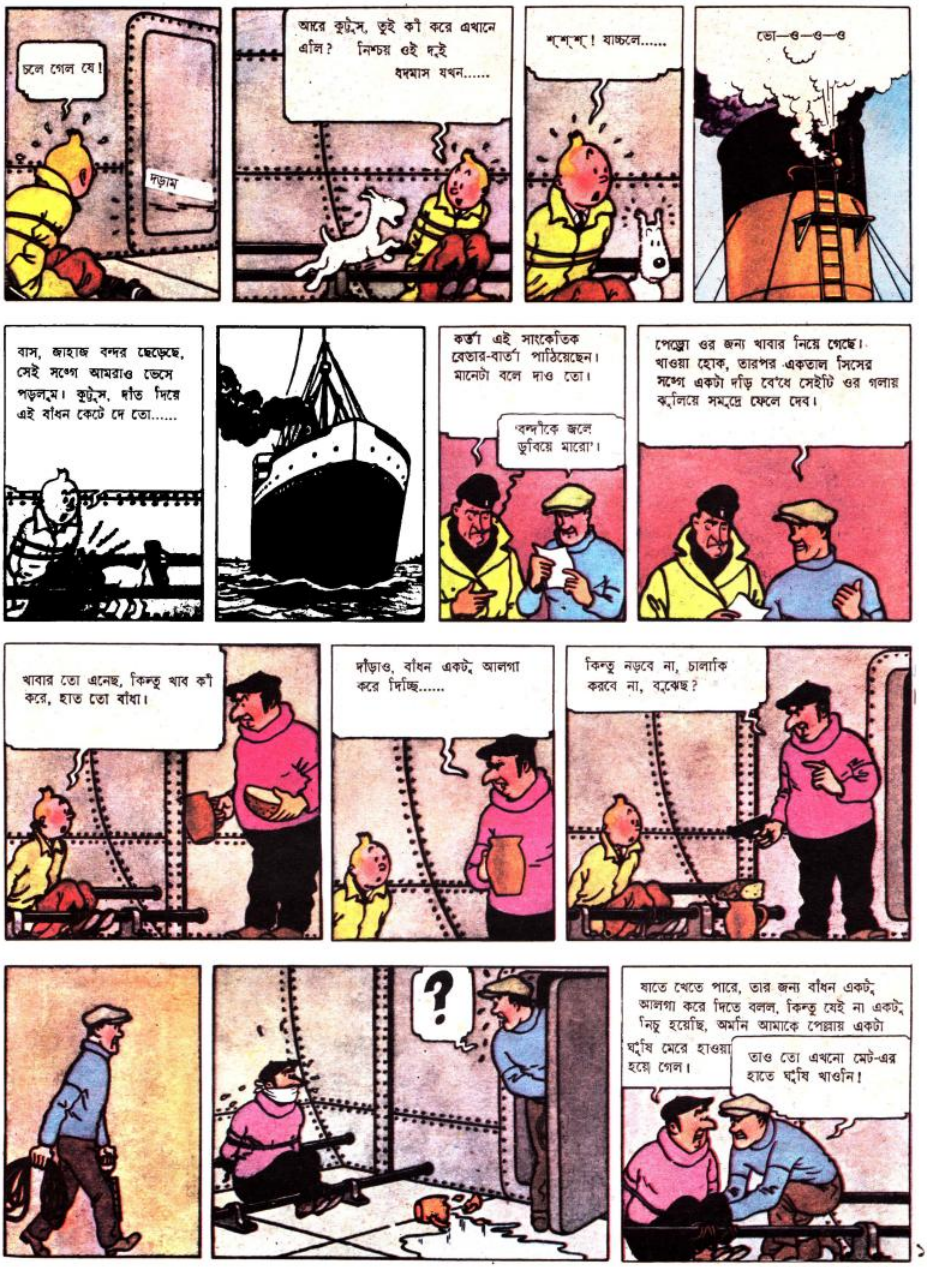

এরপর আগামী সংখ্যায়

ভারত যুদ্ধে পিঁপড়ে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মহাভারতে নেই

ভারত-যুদ্ধে পিঁপড়ে! সে আবার কি?

শুনে হাসি পাচ্ছে ত? কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না কাঠবিড়ালীরাও যেমন কাজে লেগেছিল, ভারত-যুদ্ধে মানে কুরুক্ষেত্রের সেই মহাযুদ্ধে পিঁপড়েদের সেইরকম কোনো মদৎ ছিল বলে মনে হচ্ছে হয়ত।

না, সরাসরি ভারত-যুদ্ধে পিঁপড়েদের কোন পার্ট ছিল বলে জানা নেই।

তবে,—যাক বলেই ফেলা যাক—পিঁপড়েদের—না, বহুবচনটা ভুল, আসলে—একটি ক্ষণজন্মা পিঁপড়ে তার কেরামতিটুকু না দেখালে ভারত-যুদ্ধের প্রামাণিক ইতিহাসে ওই পাঁচ লহমার ফাঁক মানে ফাঁকিটুকু থাকত না।

ক্ষণজন্মা পিঁপড়ে! তার কেরামতিতে ভারত-যুদ্ধের ইতিহাসে ফাঁক?

—কেরামতিটা কি?

তা বোঝাবার জন্যে গোড়া থেকে শুরু করা উচিত। একেবারে বাহাত্তর নম্বরের সেই দোতলার আড্ডাঘরে বত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে সুরু এক রবিবারের গুমোট সকালবেলায়।

কাগজে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দিয়েছে :—সারাদিন ভ্যাপসা গরম,—বিকালে বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রচুর বৃষ্টির সম্ভাবনা।

কাগজে ত' হপ্তাভোর রোজই ওই ভাঁওতা দিচ্ছে। কিন্তু সব ভরসাই ফরসা। না আকাশ, না টঙের ঘর থেকে এক ছিটেফোঁটা বর্ষণের লক্ষণ পাচ্ছি।

আকাশে কি টঙের ঘরে বজ্র-বিদ্যুৎ অবশ্য নেই। কিন্তু তাতেই ত' আরো জ্বালা।

বজ্রবিদ্যুতের জায়গায় দু-বেলা কোকিলের বদলে দাঁড়কাক-গিলে-খাওয়া গলার অমৃতসমান মহাভারতের কথা শুনছি।

কখনো—

গোপালের চরিত্র দেবের অগোচর।
অন্য কে কহিতে পারে ত্রৈলোক্য ভিতর॥
ব্রহ্মাণ্ড বলি যে এক চতুর্দশ লোকে।
বিরাট পুরুষ ধরে এক লোমকূপে॥
তিল অর্ধ কোটি সে ব্রহ্মাণ্ড ধরে গায়।
এমত বিরাট যার নিশ্বাসে প্রলয়॥

কখনো বা—

অশ্বত্থামা নামে হস্তী তার তুল্য অন্য নাস্তি
এমনি উত্তম গজবর।
বর্ণে তিনি জলধর, ঈষা সম দন্ত সর
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর॥
তাহে আরোহণ করি, অসে কুরু আঁধকারী
যথা আছে বীর বৃকোদর।
হাতে গদা ঘোরতর, রোষযুক্ত নৃপবর
ভীমসনে করিতে সমর।

গলাটি কার তা আর বলে দিতে হবে না নিশ্চয়।

হ্যাঁ সেই একমেবাদ্বিতীয়ম তেতালার টঙের ঘরের তিনি কিছুদিন ধরে আর সব ছেড়ে মহাভারত ধরেছেন। আমরাও সেই সঙ্গে পথে বসেছি।

সময়ে অসময়ে তাঁর নিজস্ব ট্রেডমার্ক-মারা গলায় ওপর থেকে কাশীরাম দাসের পয়ার ভেসে আসে। সে পয়ারের ঢেউ ঠেলে কোনরকমে যদি তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছোই তিনি যেন মহাভারতের অমৃতরসে ডুবে আমাদের দেখতেই পান না।

তাঁর মতিগতি একটু ফেরাবার আশায় স্বস্ত্যয়নের উপচার যোগাতে আমরা কিছু ত্রুটি করিনি এ পর্যন্ত। কখনো আমিষ কখনো নিরামিষ, সাত্ত্বিক বা তামসিক বেশ কিছু আমাদের সমভিব্যাহারে গিয়েছে।

নৈবেদ্য সামনে ধরে দিয়ে আমরা একান্ত বশংবদ হয়ে এধারে ওধারে বসেছি। তার শূন্য দৃষ্টি দু-একবার আমাদের দিকে ফিরলেও এ স্থূলে বর্তমান ভেদ করে সেই সুদূরে হস্তিনাপুরেই বোধ হয় চলে গেছে। আমরা যে তাঁর গোচরীভূত তার কোনো প্রমাণ পাইনি।

শুধু দক্ষিণ হস্তটা তাঁর নিজের অজান্তেই প্লেটের প্রত্যক্ষ বর্তমানের ওপর প্রসারিত হয়েছে। অচেতন-ভাবেই মুখে গিয়ে পৌঁছেছে তারপর।

সেখানে যান্ত্রিক দন্ত নিষ্পেষণ চলতে চলতে হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে থামায় আমরা শশব্যস্ত হয়ে বলার সুযোগ পেয়েছি—কবিরাজীটা কি জুৎ হয়নি ঘনাদা? একেবারে টাটকা ভাজিয়ে এনেছি কিন্তু!

ঘনাদার কর্ণকুহরেই বোধ হয় কথাগুলো প্রবেশ করেনি। সাড়ে তিন হাজার বছর ছাড়িয়ে গিয়ে কৃষ্ণার্জুনের কাছে অগ্নিদেবের ক্ষিদের বায়নাই তিনি তখন শুনেছেন।

হাসিয়া কহেন পার্থ, কহ বিচক্ষণ।
কোন ভক্ষ্য দিলে তৃপ্ত হইবা এক্ষণ॥
আমি অগ্নি, বলি দিয়া নিজ পরিচয়।
আশ্বাস পাইয়া বলে অগ্নি মহাশয়॥
ব্যাধিযুক্ত বহুকাল আমার শরীর।

নির্ব্যাধি করহ মোরে পার্থ মহাবীর ॥
খাণ্ডব বনেতে বহু জীবের আলয়
সেই বন ভক্ষ্য মোরে কর ধনঞ্জয় ॥
উদর পূরিয়া খাই এই অভিরুচি।
কোনো পশুপক্ষী মৎসে নাহিক অরুচি ॥

অগ্নিদেবের ক্ষিদের আবদার শোনাতে শোনাতে খাণ্ডব বনের অভাবে সামনে ধরে দেওয়া প্লেটগুলো ঘনাদা চেটে পুটে সাবাড় করেছেন। আমাদের উপস্থিতি টের পাবার কোনও লক্ষণই কিন্তু দেখা যায় নি।

মনে মনে গজরাতে গজরাতে নিচে নেমে এসেছি সবাই। আর তার পরই ঘনাদাকে কাৎ করবার এই নতুন মতলব ভাঁজা হয়েছে।

ফন্দিটা বিষে বিষক্ষয়, মানে যাকে বলে অটোভ্যাক্সিন। যা দিয়ে আমাদের জ্বালাচ্ছেন তাই দিয়ে ঘনাদাকে জব্দ করা। অর্থাৎ তাঁর ওপরই মহাভারত চাপানো।

সকাল থেকেই আমাদের তর্কটা সুরু হয়েছে। ঘণ্টার কাঁটা ছটা থেকে সাতটার দিকে যত এগিয়েছে আমাদের গলা ধাপে ধাপে তত চড়ে তেতালার টঙ পর্যন্ত পৌঁছেছে নিশ্চয়।

একদিকে শিবু আর আমি অন্য দিকে গৌর আর শিশির।

তর্ক ত' নয় যেন দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র।

ছটা একুত্রিশে শিবুর হাঁক ন্যাড়া সিঁড়িটা বোধহয় পেরিয়ে গেছে,—আলবাৎ হারত পাণ্ডবেরা।

কখখনো না!—শিশিরের প্রতিবাদ খোলা ছাদ পর্যন্ত নিশ্চয়।

কচু কাটা হত তাহলে!—আমি গলাটা টঙের ঘরে পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পেরেছি বোধহয়।

ওপরে ঘনাদার সুরেলা মহাভারত শ্লোকে আওড়ান হঠাৎ যেন থেমেছে। এই 'জিরো আওয়ার' বুঝে নিজেদের গলার পেছনে আমরাও একবার ন্যাড়া সিঁড়ি বেয়ে টঙের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছি। পেছন দিকে তাকিয়ে খাবারের ট্রে সমেত বনোয়ারী ঠিক হিসেব মত হাজির হবার জন্য তৈরী কিনা দেখে নিতে ভুলিনি।

তারপর টঙের ঘরে গিয়ে দোতালার তর্কটা একেবারে যেন তপ্ত খোলা থেকে নামিয়ে দিয়েছি ঘনাদার সামনে।

গৌর প্রায় বিধানসভার মেজাজ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ঘনাদার কাছে স্পীকারের রুলিং চেয়েছে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে—শুনেছেন শুনেছেন এদের কথা! বলে পাণ্ডবরা নাকি গোহারান হারত কুরুক্ষেত্রে!

হারতই ত'—শিবু তাল ঠুকেছে ঘনাদার তত্ত্বপোষটাই চাপড়ে—দুর্যোধন অমন গবেট না হলে তুলোধোনা হত পাণ্ডবেরা।

তুলোধোনা হত পাণ্ডবেরা!—শিশির আর গৌর যেন অর্জুনের গাণ্ডীব আর ভীমের গদা-ই হাতে নিয়ে হুঙ্কার দিয়েছে—কে তুলোধোনা করত, কে? দুর্যোধনের নিরানব্বই-এর বদলে আরো ন'শ নিরানব্বইটা ভাই থাকলেও, তাতে কুলোত না।

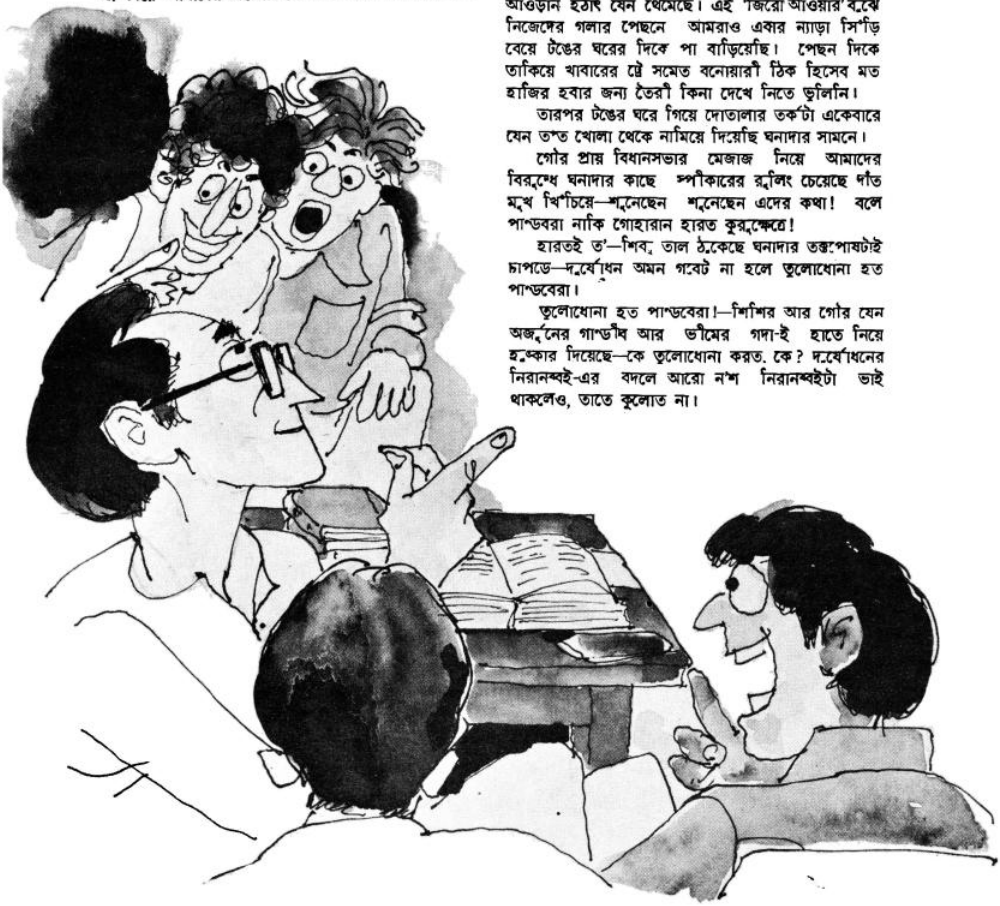

দুর্যোধনের ভাইএ'দর আবার ডাকা কেন? —আমি গলায় একেবারে লঙ্কাবাটা মাখিয়ে বলেছি,—তাদের মাঠে নামবার দরকারই হত না। গ্যালারিতে বসেই তারা ফাইন্যাল দেখতে পেত। দেখত কর্ণ—হ্যাঁ একা সুতপুত্র কর্ণ কেমন করে কুরুক্ষেত্রের কাঁকুরে মাটিতে পাঁচ ভাই পাণ্ডবের নাকগুলো ঘসে দেয়। নেহাৎ দুর্যোধন নিজের আহাম্মকীতে রেফারীকেই খচিয়ে দিলে তাই।

কথাগুলো বলতে বলতে আড়চোখে ঘনাদার দিকে অবশ্য নজর রেখেছি। এত পাঁয়তাড়া যে জন্যে কষা সে মতলব একটু হাসিল হচ্ছে কি?

কোথায়?

ঘনাদা তাঁর কাশীরাম দাসের বিরাট গন্ধমাদনটি সামনে খুলে ধরে শোলোক আওড়ানো থামিয়েছেন বটে, কিন্তু নিজে যেন তাঁর এই টঙের ঘরেই আর নেই। দেহটা শুধু ফেলে রেখে কুরুক্ষেত্রেই বুঝি চরতে গেছেন।

তা গেছেন যান। ফিরতে যাতে হয়, তার জন্য নায়াচ, নালিক, পাশুপত থেকে ব্রহ্মাস্ত্র পর্যন্ত সবরকম অস্ত্রের ব্যবস্থা না করে আজ আমরা আসিনি।

দু' এক সেকেণ্ডের ফাঁক যা পড়েছিল রেফারী কথাটার খেই ধরে তা ঢেকে গোঁর খিঁচিয়ে উঠল—রেফারী! রেফারী আবার কে?

রেফারী কে জানো না! —সঙ্গে সঙ্গে শিবুর টিটকিরি আর আমার নব মহাভারত পাঠ শুরু।

শিশির আর গোঁরের দিকে চেয়ে কানমলা দেওয়া গলায় বললাম, —মহাভারতটাও পড়িস নি! শোন তাহলে—

মহাভারতের কথা কি কহিব আর।
কি হলে যে কি হইত অন্ত পাওয়া ভার।।
দুর্যোধন দুর্ভাগার মতিচ্ছন্ন হইল।
পদতল ছাড়িয়া বুদ্ধু শিয়রে বসিল ॥
তাই না চটে চতুর কৃষ্ণ গাড়োয়ান হইয়া।
পাণ্ডু বয়েজ টীমকে দিলেন ম্যাচটা জিতাইয়া॥
চালের ভুলে রুল্ট যদি না হতেন রেফারী।
কুরুক্ষেত্রে যায় কুরুরা পেনাল্টিতে হারি? ॥

ঘনাদার দিকে চোখ রেখেই পদগুলো আওড়াচ্ছিলাম, কিন্তু শুভলক্ষণ কিছু দেখলাম না। ঠিক কুরুক্ষেত্রে না থাকলেও এখনও হস্তিনাপুর ছেড়ে তিনি আসতে প্রস্তুত নন মনে হল।

ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিটে বনোয়ারী তখন ঘরে ঢুকে ঘনাদার সামনে খাস্তার কচুরি আর অমৃতির প্লেট দুটো ট্রে থেকে নামিয়ে রাখছে।

ঘনাদার মুখের ভাব দেখে মনে হল এবারে তার হস্তিনাপুরের প্রবাস থেকেই তিনি আনমনে সে প্লেটে হাত বাড়াতে দেরী করবেন না।

ব্রহ্মাস্ত্রটা চটপট তাই প্রয়োগ করতে হল এবার।

ঘনাদার লুব্ধ হাত প্লেটে এসে পৌঁছোবার আগেই দুদিক থেকে গোঁর ও শিবু চক্ষের নিমেষে দুটি প্লেট তুলে নিয়ে বনোয়ারীকে ধমকে উঠল—কি হচ্ছে কি এসব! যখন তখন খাবার দিলেই হল! এখন এসব কে আনতে বলেছে!

বনোয়ারী অভিনেতা নয়। আগে থাকতে অনেক শেখানো পড়ানো সত্ত্বেও গোঁর শিবুর ধমক খেয়ে সে সব ভুলে তোতলা হয়ে গিয়ে দুবার শুধু 'হ্যামি হা...মি...ত' গোছের কিছু একটা উচ্চারণ করল। আমাদের মতলব হাসিলের পক্ষে তাই কিন্তু যথেষ্ট।

ঘনাদার মুখের চেহারাটা তখন সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার হস্তিনাপুর থেকে এক ঝটকায় উনিশশ' পঁচাত্তরের বাহাত্তর নম্বরে এসে পড়ার জন্যেই বোধহয় বেশ একটু ভ্যাবাচাকা।

আর যাই হোক এরকম একটা অবস্থার কথা তিনি কল্পনা করতেই পারবেন না জেনে মতলবটা ভাঁজা হয়েছিল।

কচুরি অমৃতির প্লেট দুটো বনোয়ারীর ট্রেতে তুলে তাকে চলে যাবার হুকুম দেওয়ার সঙ্গেই কাজ যা হবার হল।

ঘনাদা অবশ্য এইটুকুর মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়েছেন। সেই ভ্যাবাচাকা ভাবটা মুখ থেকে মুছে এতক্ষণে যেন আমাদের সম্বন্ধে সচেতন আর বনোয়ারীর প্রতি করুণাময় হয়ে উঠলেন, —আহা বেচারাকে মিছে কষ্ট দেওয়া কেন? আবার ত' সেই আনতেই হবে ওকে!

ওগুলো রেখে যেতেই বলছেন! —আমাদের গলায় একটু মৃদু প্রতিবাদের সুরেই ফোটালাম—কিন্তু আমাদের জরুরী কথাগুলো.....

কি তোমাদের জরুরী কথা বলো না!— ঘনাদা বনোয়ারীর হাত থেকে পুরো ট্রেটা একরকম কেড়ে নামিয়ে নিলেন—এগুলোর ত' আর গলা নেই যে গোলমাল করবে। বলে ফেলো কি তোমাদের জরুরী কথা!

ঘনাদার শেষ কথাগুলো মুখে ঠাসা কচুরি ভেদ করে একটু জড়ানো অবস্থাতেই বার হল। আবার পাছে মুখের গ্রাস ফসকে যায় এই ভয়ে তিনি তখন প্রায় দুহাতে কচুরি আর অমৃতি মুখে বোঝাই করছেন।

তা যা করেন করুন। আমরা এতদিনে তাঁকে বাগে পেয়েই খুশি। বেশ একটু জমিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, —জরুরী কথাটা কি, তা এখনো বোঝেন নি? শুনুন না ওই আহাম্মকদের কথা। বলে কিনা পাণ্ডবরা কিছুতে হারত না!

আহাম্মকেরা মানে শিশির গোঁর। তারাও ঠিক সিনেরিও মাফিক ঝাঁপিয়ে উঠল,—কখখনো হারত না, কিছুতেই হারত না।

শুনলেন? শুনলেন ত! —একটা জমজমাট বৈঠকের আশায় জ্বলজ্বলে চোখে ঘনাদার দিকে তাকালাম—এই ওদের মহাভারতের বিদ্যের দৌড়। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের জিৎ নাকি হতই! আপনিই বলুন ত' ঘনাদা!

ওই উসকানিটুকু দিয়েই আমরা চুপ। ঘনাদার বাঁধানো দাঁতে মচমচে অমৃতি চিবানোর শব্দ ছাড়া ঘরে আর আওয়াজ নেই। যে খেইটা জুগিয়ে দেওয়া গেছে তা থেকে কি গুলগপ্পর গালিচা ঘনাদা বুনে তোলেন তা দেখবার জন্যে আমরা একেবারে উদগ্রীব।

কিন্তু ঘনাদা অমন করে শোধ নেবেন তা কি জানি! শোধ তাঁর মুখের খাবার সরিয়ে নিয়ে তাঁকে দাগা দেবার।

গালচের আশা একেবারে খচ্চেপোঁশে কুঁকড়ে দিয়ে ঘনাদা যেন মর্স কোডে জানালেন,—তাই!

তাই! কি তাই? —আমরা যেমন হতাশ তেমনি অস্থির। —পাণ্ডবদের জিৎ হত-ই বলতে চান?

হ্যাঁ! —এবার ঘনাদার সংক্ষিপ্ত সরল জবাব।

দুর্যোধন যদি দলে টানতে গিয়ে ঘুমন্ত শ্রীকৃষ্ণের শিয়রে না বসে পায়ের দিকে বসত তবুও! —আমরা শেষ আশার ষেটুকু সাধ্য চাগাড় দিলাম।

যদি কেন, পায়ের দিকেই ত বসেছিল দুর্যোধন!

—ঘনাদা এতক্ষণে বোমাটি ছাড়লেন।

পায়ের দিকেই বসেছিল দুর্যোধন? —চোখগুলো যতটা পারি ছানাবড়া করে বললাম, —কিন্তু মহাভারতের কোথাও ত নেই! পায়ের বদলে মাথার দিকেই দুর্যোধন বসেছিল বলে ত' লেখা আছে।

লেখা যা আছে তাও ঠিক!

তাও ঠিক? —ঘনাদার ধাঁধায় এবার একটু কাবু হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম—পায়ের দিক মাথার দিক হয় কি করে?

হবার কারণ অতি সোজা! —ঘনাদার মুখে যেন একটু অনুকম্পার হাসি, —শ্রীকৃষ্ণ ঘুমের মধ্যে উল্টে শুয়েছিলেন বলেই পায়ের দিকটা মাথার দিক হয়ে গিয়েছিল।

ঘুমের মধ্যে উল্টে শুয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ? —এবার আর আমাদের অবাক হবার ভান করতে হল না।

হ্যাঁ উল্টে শুয়েছিলেন। —ব্যাখ্যা করলেন ঘনাদা, দুর্যোধন বোকা যেমন নয়, তেমনি গড়িমসি আলসেমিও তাঁর ধাতে নেই। অর্জুন রথে ঘোড়া জুতে রওনা হতে না হতেই দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের শিবিরে এসে হাজির। বাসুদেব ঘুমোচ্ছেন শুনে সে শোবার ঘরেই গেল অপেক্ষা করতে। ঘরে ঢুকেই সে কিন্তু একটু ফাঁপরে পড়ল। ঘুমন্ত বাসুদেবের মাথার দিকে যেমন পায়ের দিকেও তেমনি একটি করে আসন পাতা। এখন কোথায় তার বসা উচিত। ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত সে পায়ের দিকেই বসল।

শ্রীকৃষ্ণ এবার পড়লেন মুস্কিলে। তাঁর ত কপট নিদ্রা। যা ভেবেছিলেন দুর্যোধন তার উল্টোটা করেছে জেনে, আর কোনো উপায় না পেয়ে নিজেও তিনি ঘুমের মধ্যেই যেন স্বপ্নে উঠেপড়ার ভান করে উল্টে শুলেন।

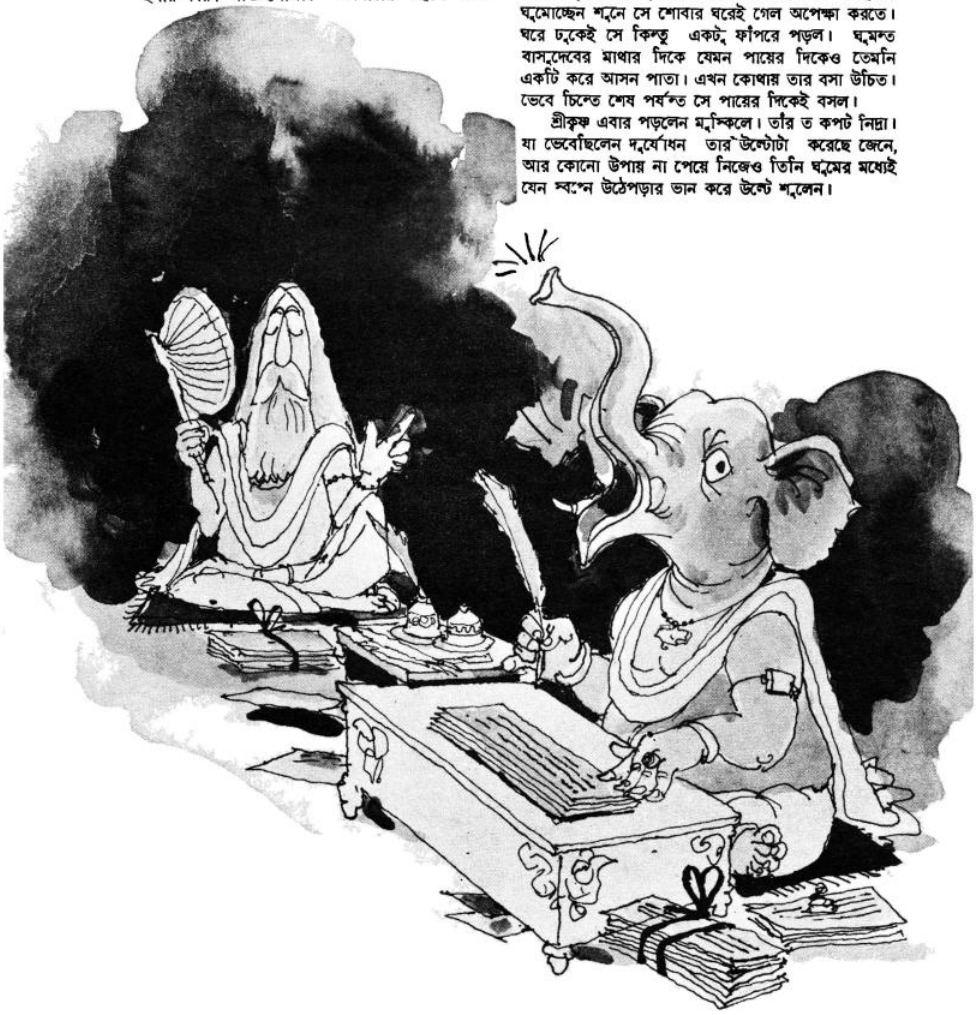

দুর্যোধন আহাম্মক নয় কিন্তু অহঙ্কারী। শ্রীকৃষ্ণকে ঘুমের মধ্যে উল্টে শুতে দেখে তার দেমাকে একটু সুড়সুড়িই লাগল। ভাবল, বাসুদেবের ঘুমের মধ্যেও তার মত রাজাগজাকে পায়ের দিকে রাখতে বাধছে। এই দম্ভেই হল তার মরণ। নইলে মাথা থেকে আবার পায়ে গিয়ে বসতে পারত না!

কিন্তু?—আমরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এসব কথা মহাভারত থেকে সরালে কে? সেই আপনার ভীমসেন দারুক আর বন-বরা মার্কা মুষিক কোম্পানী?

না।—ঘনাদা বনোয়ারীর সদ্য এনে হাজির করা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে একটু হাসলেন,—এ বৃত্তান্ত সরাবার দরকার হয়নি, কারণ লেখাই হয়নি মহাভারতে।

লেখাই হয়নি! —আমরা সত্যিই তাজ্জব—কেন?

কেন জানতে চাও? —ঘনাদা শিশিরের ধরিয়ে দেওয়া সিগারেটে রামটান দিয়ে তার ধোঁয়ার সঙ্গেই চোখবুজে যেন ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন।

এ ধ্যান কি ভাঙবে?

আমরা গরুড়পক্ষী হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছি।

ধ্যান শেষ পর্যন্ত ভাঙল আর চক্ষু উন্মীলন করে সামনের দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে তিনি ত্রিকালদৃষ্টির যে নমুনা দেখালেন তাতে আমরা হাঁ।

কেন লেখা হয়নি তা,—সামনের ফাঁকা দেয়ালটার দিকে সিগারেট-ধরা আঙুল দুটোই উঁচিয়ে তিনি বললেন, ওই ওর তস্য তস্য আদি সপ্তশত সঙ্ঘভ্রাতা হয়ত বলতে পারত!

মাথাগুলো তখন ঘুরতে সুরু করেছে। ঘোরার আর অপরাধ কি? সঙ্ঘ ভ্রাতা, তস্য তস্য, আদি সপ্তশত—এ সব কি বলছেন ঘনাদা! আর বলছেন কিনা ওই সেদিনের চুনকাম-করা শাদা দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে।

ওখানে ও সব বলে সম্বোধন করছেন কাকে?

যাকে করছেন অনেক কষ্টে তাকে আবিষ্কার করা গেল এরপর। আবিষ্কার যা করলাম চক্ষু তাতে চড়কগাছ। ঘনাদার দিকে ফিরে হতভম্ব হয়েই তাই বলতে হল,—ওখানে ত একটা শুধু সুড়সুড়ে পিঁপড়েই দেখছি!

হ্যাঁ, ওই।—ঘনাদা ধ্যান নিমীলিত হয়েই বললেন।

হ্যাঁ, ওই! সুড়সুড়ে পিঁপড়ে। ওরই কি বললেন, তস্য তস্য সার্ধতিনসহস্র-আদি......

হ্যাঁ, হ্যাঁ!—ঘনাদা আমাদের থামিয়ে দিয়ে জ্ঞান দিলেন। ব্যাখ্যা করে বোঝালেন,—কুরুক্ষেত্রের ভারতযুদ্ধের আগে পরে যা যা হয়েছে দিব্যদৃষ্টিতে সবই ব্যাসদেবের জানা। তিনি রেখে ঢেকে কিছু বলবার মানুষ নন আর যত ঝড়ের বেগেই বলুন গণেশঠাকুরের সর্টহ্যাণ্ডে তা ধরা না পড়েই পারে না। তবু যে মহাভারত থেকে ওই মোক্ষম খবরটুকু বাদ পড়েছে তার মূলে হল ওই সুড়সুড়ে পিঁপড়ে। ও মানে, ওরই সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার তস্য তস্য কোনো বাসাতুতু ভাই। পরমায়ু ওদের চার থেকে সাত বছরের বেশী নয় বলে গড়পড়তা হিসেবে আদি সপ্তশত সঙ্ঘ-ভ্রাতা বলছি। কথায় কথায় বুকের মধ্যে যিনি বিশ্বরূপ দেখান, বিশ্বচরাচর যাঁর রেফারীগিরিতে চলে সেই চতুর চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মান বাঁচাতে ওই সামান্য পিঁপড়েটিকেই বেছে নিয়েছিলেন' পিঁপড়ে ত নয়, ও আদি কীটাবতার, একাই পৃথিবীর প্রথম পঞ্চমবাহিনী।

ঘনাদা থামলেন। আমাদের ধরা গলায় আর টুঁ শব্দটিও নেই দেখে ঘনাদা শেষ জ্ঞানটুকুও দিলেন।

দুনিয়া যাঁর নখের টেলিভিশনে, কোথায় কি হচ্ছে তা ত আর তাঁর জানতে বাকি থাকে না। দ্বারকায় বসেই তিনি টের পেলেন ব্যাসদেব তাঁর কপট নিদ্রার বৃত্তান্ত এবার বলতে সুরু করছেন। গড় গড় করে বলে যাচ্ছেন ব্যাসদেব, সড় সড় করে কলম চলছে গণেশ ঠাকুরের, এমন সময় লেখার চৌকির ওপরই গড়িয়ে রাখা গণেশ ঠাকুরের শুঁড়টা সুড়সুড়িয়ে উঠল। অনেক—চেষ্টা করেও সামলাতে পারলেন না গণেশ ঠাকুর। দুর্দান্ত একটি হ্যাঁচ্চোতে পুঁথির পাতা উড়ল, কলমও থামল কটি পলকের জন্যে। আবার যখন চলল ব্যাসদেবের ডিক্টেশন, তখন কেষ্ট-ঠাকুরের কারসাজি পার হয়ে গেছে।

ছবি এঁকেছেন ॥ সুধীর মৈত্র

কুকুরের গায়ে কম ঘাম কেন

খুব কম ঘামে কুকুরেরা। দেহের তাপমাত্রা ঠিক ঠিক রাখবার জন্যেই শরীরে ঘামের দরকার করে। কিন্তু কুকুরের এবং আরো কিছু কিছু জন্তুর বেলায় ঘামের বদলে দম নেওয়ার মধ্যেও শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। অবশ্য কিছু কিছু তাপ তাদের গায়ের চামড়া দিয়েও বেরিয়ে যায়। কুকুর একবার দৌড়েই খুব ঘন ঘন দম নেয় বা হাঁপায়। ঘাম বেরুলে যা কাজ হয়, এইভাবে হাঁপিয়েও সেইরকম ঠাণ্ডা হওয়া যায়। শরীরের বাড়তি তাপ বেরোয় কিসে? প্রধানত ফুসফুস দিয়ে। এই বাড়তি তাপ বের করে ফেলতেই হয়। তেমনি খুব ঘন ঘন এবং দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিলে, ফেললেও তাপ তাড়াতাড়ি এবং বেশি পরিমাণে নেমে যেতে থাকে। কুকুর খুব কম পরিমাণ ঘামে। আর, সেই ঘাম বেরোয় পায়ের তলা দিয়ে। সেখানেই তাদের সবচেয়ে বড় ঘর্মনালী আছে। সেইজন্যেই, তোমরা হয়তো দেখে থাকবে, কুকুর হেঁটে যাবার পর মেঝেয় ভিজে ভিজে ছাপ পড়ে। শক্ত কাঠের তক্তাতেও ফুটে ওঠে সেই ছাপ। এটা হয় গরমকালে। কুকুরের পেটের তলার থলিতেও কিছু কিছু ঘামের নালী আছে। কিন্তু শরীরের আর কোন জায়গায় এই নালী আসে নি, তাই গায়ের চামড়ার সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। আমাদের আরেকটি মস্ত ভুল ধারণা আছে। আমরা মনে করি কুকুরের মুখ, নাক, চোয়ালের কাছ দিয়ে বুঝি ঘাম পড়ে। এটা কিন্তু এক-দম ঠিক নয়। যে জল-জল জিনিস আমরা কুকুরের নাকে, চোয়ালে দেখি সেটা হচ্ছে নাকের পাশে একরকমের লালাগ্রন্থি। গরম লাগলে কুকুর আপনা-থেকেই তার জিব বের করে। জিব তাদের হাতপাখা।

ডোডো তাতাই পালা কাহিনী

তারাপদ রায়

রাস্তার পাশে একটা বাড়ি, বাড়িটির একতলায় জানলার ধারে বসে ডোডোবাবু ভূগোল পড়ছেন। জানলার ওপারে রাস্তায় ফুটপাথের উপরে একটি সাদা কুকুর থাবার উপর থুতনি রেখে অনিমেষ নয়নে ডোডোবাবুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, ডোডোবাবু পড়তে পড়তে যদি কখনো চোখ তুলে কুকুরটির দিকে তাকাচ্ছেন কুকুরটি সঙ্গে সঙ্গে মৃদু লেজ নাড়াচ্ছে। কুকুরটির নাম তুষারকণা, তার রঙ সম্পূর্ণ সাদা বলে এই নাম দেওয়া হয়েছে। তুষারকণা স্বভাবত লোভী, ডোডোবাবুর হাতে দুটো বিস্কুট রয়েছে, ভূগোল পড়তে পড়তে বিস্কুট খাচ্ছেন, দুই-এক খণ্ড যদি খেতে খেতে ছুড়ে দেন এই আশায় তুষার-কণা বসে রয়েছে।

এই সময় বাড়ির ভিতর থেকে 'ডোডো, ডোডো' ডাক শোনা গেলো। ডোডোবাবুর মা ডোডোবাবুকে ডাক লেন। ভূগোলের বইয়ের উপর অবশিষ্ট বিস্কুটটুকু রেখে ডোডোবাবু জানলার উপরে বইটি ফেলে বাড়ির ভিতরে গেলেন। লোভী তুষারকণা একটু ইতস্তত করে তারপর হঠাৎ সামনের পা দুটো জানালার দিকে বাড়িয়ে বিস্কুটশুদ্ধ ভূগোল বইটা মুখে তুলে নিলো।

ফুটপাথ দিয়ে তাতাইবাবু যাচ্ছি-লেন, তিনি এই দৃশ্য দেখে চীৎকার করে উঠলেন, ডোডোবাবুও বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে এলেন। বেগতিক দেখে তুষারকণা ভূগোল বইটা মুখ থেকে ফেলে বিস্কুটটুকু নিয়ে ছুট দিলো, দুঃখের বিষয় বিস্কুটের সঙ্গে

ভূগোলের দুটো পাতাও তুষারকণার সঙ্গে চলে গেলো।

ডোডোবাবু-তাতাইবাবু দুজনেই পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানেন তুষারকণার সঙ্গে এখন ছুটে লাভ নেই। দুজনেই পলায়মান তুষারকণার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে জানালার তাকে এসে পাশাপাশি বসলেন।

ডোডোবাবু (বিমর্ষ স্বরে): সর্বনাশ হয়ে গেলো।

তাতাইবাবু: এতো সামান্য। এতে হতাশ হচ্ছেন কেন? জানেন বিড়ালে আমার পুরো অঙ্ক খাতাটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।

ডোডোবাবু: সেতো আপনি ইচ্ছে করে বিড়াল দিয়ে ছিঁড়িয়েছেন, সে আমি সব জানি। কিন্তু আমি কি করি এখন?

তাতাইবাবু (রেগে গিয়ে): আমি ইচ্ছে করে বিড়াল দিয়ে অঙ্ক খাতা ছিঁড়িয়েছি? কি বলছেন আপনি?

ডোডোবাবু: ঠিকই বলছি, আমি সব দেখেছি, সেদিন সন্ধ্যাবেলা অঙ্ক কষতে কষতে আপনি যতবার অঙ্ক মিলছে না বারবার বিড়ালটার দিকে খাতা ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন আর সে খেলা ভেবে আঁচড়াচ্ছিলো, আমি সব দেখেছি। আপনি মাকে তারপর বললেন, বিড়ালে খাতা ছিঁড়ে দিয়েছে। আর আপনার জন্যে নির্দোষ বিড়ালটা মার খেলো। আপনি ভাবছেন, আমি কিছু জানি না। একদিন দেবো আপনার মাকে সব বলে।

তাতাইবাবু (ভয় পেয়ে): আরে আপনার কাছে আমার কি কিছু গোপন আছে? সে যা হোক্, আপনার ভূগোলের কি করা যায় বলুন তো?

ডোডোবাবু: কি আর করা যাবে? দুটো পাতার উপর দিয়ে গিয়েছে এই যথেষ্ট।

তাতাইবাবু (একটু ভেবে): দুটো পাতা মানে চারটে পৃষ্ঠাতো মাত্র।

ডোডোবাবু: মাত্র চারটে পৃষ্ঠা ঠিকই, কিন্তু সেই চার পৃষ্ঠা এখন কোথায় পাই?

তাতাইবাবু: কোন্ চার পৃষ্ঠা? খুলুন না ভূগোল বইটা, কোথায় পাতা খোয়া গেছে একটু দেখাই যাক্ না।

ডোডোবাবু (ভূগোল বইটা খুলে একটু দেখে নিয়ে): এশিয়ার শেষ আর আফ্রিকার শুরু। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এর পরে এখানে কি একটা দেশ ছিলো।

তাতাইবাবু: ঠিক আছে।

ডোডোবাবু: কি ঠিক আছে?

তাতাইবাবু: এত দেশের বিবরণ এতকাল পড়ছি, আরেকটা দেশের বিবরণ নিজেরা তৈরী করতে পারবো না।

ডোডোবাবু: করুন দেখি।

তাতাইবাবু: দেশটার খুব সুন্দর নাম দিতে হবে। বর্ণনাও সুন্দর করতে হবে।

ডোডোবাবু: কি নাম দেবেন?

তাতাইবাবু: তাই ভাবছি।

ডোডোবাবু: তাই ভাবুন।

তাতাইবাবু (একটু থেমে উত্তেজিত কণ্ঠে পাঠ্যপুস্তকের ভাষায়): যেখানে এশিয়া মহাদেশ শেষ হইয়াছে আফ্রিকার শুরু হইয়াছে সেইখানে মরুভূমির প্রান্তে একটি ছোট সুন্দর দেশ আছে, স্থানীয় অধিবাসীরা দেশটির নাম বলে মানু-মানু।

ডোডোবাবু: আপনার বিড়াল ছানাটার নাম না মানু-মানু?

তাতাইবাবু: তাতে কি হয়েছে? জানেন ভারত সরকার নামে কত লোক আছে।

ডোডোবাবু: জানি। কিন্তু তারপর।

তাতাইবাবু: তারপর। (একটু থেমে।) মানু-মানু রাজ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। ইহার একদিকে বিশাল পর্বত অপরদিকে গভীর সমুদ্র আর দুই দিকে ধূ ধূ মরুভূমি এবং গহন জঙ্গল। এখানে কয়েকটি সুন্দর নদী আছে, তাহার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর নদীটির নাম রিয়ামিয়া।

ডোডোবাবু: এবার আমি বলি। রিয়ামিয়া নদীর তীরে একটি শহর আছে তাহার নাম থরহরি। এই শহরটির এইরূপ নামকরণের কারণ মাঝে-মধ্যে এখানে ভূ-কম্পন অনুভূত হয়।

তাতাইবাবু: অবশ্য এই ভূকম্পনে কোনোদিন কোনোরূপ ক্ষতি হয় না, শুধু চিনাবাদাম দোলানগুলি একটু বেশি পরিমাণে দোলে।

ডোডোবাবু: রিয়ামিয়া নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে প্রচুর কুল, জলপাই এবং চিনাবাদাম উৎপন্ন হয়। মানুমানু দেশ রবারের জন্য বিখ্যাত, এখানে বালকদের খেলিবার রবারের বল প্রায় বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

তাতাইবাবু (একটু বিরক্ত হয়ে): আপনি খালি একা-একা বলে যাচ্ছেন।

ডোডোবাবু: ঠিক আছে এবার আপনি বলুন।

তাতাইবাবু: মানু-মানু দেশের

জীবজন্তুর মধ্যে হলুদ শৃগাল এবং ট্যাঁচু পাখি অতি প্রসিদ্ধ।

ডোডোবাবু: হলুদ শৃগাল, ট্যাঁচু পাখি এসব আবার কি বলছেন।

তাতাইবাবু: আরে মশায় যা বলছি শুনুন আগে, এ দুটো এই মাত্র বানালাম।

মানু-মানুর হলুদ শৃগালের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের শৃগালের প্রধান তফাৎ এই যে অন্ধকার হইলে এই জাতীয় শৃগালগুলি ডাকে না। ফলে গ্রামাঞ্চলে শিশুরা রাত্রিতে শৃগালের ডাক শুনিয়া ভয় পায় না।

ট্যাঁচু এক ধরণের ঘন কালো রঙের চড়ুই-এর আকারের পাখি, ইহারা মশা খাইয়া জীবনধারণ করে, রাত্রিবেলা ইহাদের কালো রঙ অন্ধকারে সম্পূর্ণ মিশিয়া যায়, ফলে মশারা ইহাদের দেখিতে পায় না। মানু-মানু দেশে কোনো মশার উৎপাৎ নাই।

ডোডোবাবু: এবার আমাকে বলতে দিন, মানু-মানুর আবহাওয়া চমৎকার সাত্যিকারের নাতিশীতোষ্ণ, সমস্ত বৎসর ধরিয়া প্রতিদিনই যাহাকে বলে শীত ও গ্রীষ্ম সমান-সমান।

এখানে বৃষ্টিপাত সাধারণ, কিন্তু সরস্বতীপুজো, দুর্গাপুজো, ফুটবল খেলার দিন কখনো একটু বৃষ্টি হয় না।

তাতাইবাবুঃ আবহাওয়ার কথা যখন বললেন, এবার তাহলে এখানকার অধিবাসীদের কথা বলুন।

ডোডোবাবু (যেন মুখস্থ বলছেন, স্লেটের পড়া বলার মত গড়গড় করে)ঃ এখানকার অধিবাসীরা অতি শান্ত স্বভাবের, তাহারা শিশু বা বালকদের কখনো মারধোর করে না। কিন্তু তাহারা স্বাধীনচেতাও বটে শিশু বা বালকদের কার্যকলাপে কখনো হস্তক্ষেপ করে না।

তাতাইবাবু (হাততালি দিয়ে)ঃ চমৎকার। আপনার দেখি মাথা খুলে গেছে। এবার আমার কাছে শুনুন।

এখানকার শহরগুলি চমৎকার কখনো আলো নেভেনা। শহরের সর্বত্র ছেলেমেয়েদের খেলিবার জন্য যথেষ্ট বন্দোবস্ত আছে। ইহা ছাড়া ছেলে-মেয়েরা যে সকল পথে খেলাধুলা করে, সেখানে কোনো গাড়িঘোড়া যাতায়াত করে না।

ডোডোবাবুঃ আইসক্রিমের গাড়ি-ও না?

তাতাইবাবুঃ ভূগোল বইয়ে আবার

আইসক্রিমের গাড়ি কি মশায়?

ডোডোবাবুঃ টাঁচু পাখি, হলুদ শৃগাল, থরহরি শহর থাকতে পারে আর আইসক্রিমের গাড়ি থাকতে পারে না?

তাতাইবাবুঃ পারে, কিন্তু মানু-মানু রাজ্যের আসল কথাটাই এতক্ষণ আপনাকে বলা হয় নি।

ডোডোবাবুঃ আসল কথা? সেটা কি?

তাতাইবাবুঃ আসল কথাটা হলো, এই দেশে ভূগোল বইয়ের পৃষ্ঠা হারাইয়া গেলে বা কুকুরে লইয়া গেলে তাহা আবার রাস্তায় কুড়াইয়া ফেরৎ পাওয়া যায়।

ঐ দেখুন (একটু দূরে আঙুল দিয়ে দেখালেন।)

[সত্যিই দেখা গেলো একটু দূরে ফুটপাথের পাশ ঘেঁষে ভূগোলের পাতা দুটি পড়ে রয়েছে. ডোডোবাবু দৌড়ে গিয়ে কুড়িয়ে নিলেন. তারপর হাততালি দিয়ে উঠলেন. তাতাইবাবুও হাততালি দিলেন। হাততালির শব্দ শুনে তুষারকণাও কোথা থেকে ছুটে এসে লেজ নাড়তে লাগলো।]

ছবি এঁকেছেন ॥ সুবোধ দাশগুপ্ত

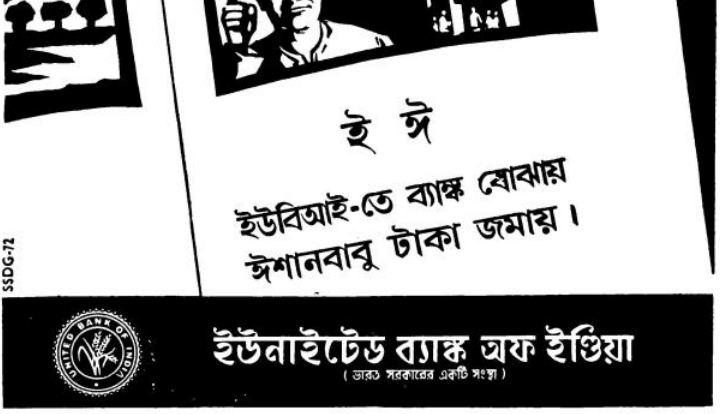

মুক্তার জন্মকাহিনী

দুলেন্দ্র ভৌমিক

আমার নাম মুক্তা। আমাকে তোমরা অনেকেই দেখেছো. কারো গলার মালায়, কারো কানের দুলে কিংবা কারো কারো হাতের আংটিতে। আমার নাম জানে না এমন লোক আজ আর পৃথিবীতে নেই। তোমরা নিশ্চয়ই জান, আমি এক মহা মূল্যবান রত্ন। ঐতিহাসিকরা বলেন, অনেক—অনেক কাল আগে থেকেই নাকি আমি মানুষের পরিচিত রত্ন। সেই অনেক কাল আগের সময়টাকে বলা হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগ।

কিন্তু সে যুগের মানুষ তো তোমাদের মতো সব দিক থেকে এত উন্নত ছিল না, তাই আমার সম্পর্কে তখনকার মানুষদের ধারনা ছিল হাস্যকর। আমার জন্ম সম্পর্কে কেউ সঠিক কিছু জানত না বলে তাদের মধ্যে অনেক রকম ধারণা চালু ছিল, যা শুনলে আমার মতো তোমরাও হাসবে। যেমন, একদল মানুষ মনে করত, শিশিরবিন্দু থেকেই নাকি আমার জন্ম। আবার আরব দেশের লোকেরা বলত, ঝিনুক খুব ভোরবেলা জলের ওপর ভেসে উঠে শিশিরবিন্দু খায়। সেই সময় ঝিনুকের দেহের ওপর সূর্যের আলো পড়ে। সূর্যের আলো আর বাতাসের প্রভাবে ঝিনুকের দেহের মধ্যেকার শিশিরবিন্দু আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে গিয়ে আমার জন্ম।

তোমরাই বল. নিজের জন্ম সম্পর্কে এসব আজগুবি কথা শুনলে কার না হাসি পায়। প্রায় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত আমার জন্ম নিয়ে মানুষের মধ্যে এ রকম নানা আজগুবি মত চালু ছিল। কিন্তু ঐ সপ্তদশ শতাব্দীতেই রেমা নামে এক বিজ্ঞানী এবং তারো পরে ফরাসী দেশের বিজ্ঞানী লিনে অনেক গবেষণা করে আমার জন্ম সম্পর্কে ঠিকঠাক কথা বলতে আরম্ভ করেন। তাঁদের কথার মূল বিষয়টা তোমাদের বলি, তাহলেই আমার জন্মের ব্যাপারটা বুঝতে পারবে; ঝিনুকের খোলার মধ্যে খুব সাবধানে একটি ছোট ফুটো করে তার মধ্যে যদি কোন 'উত্তেজক বস্তু' অর্থাৎ একটি বালুকণা, কাঠের গুঁড়োর একটু দানা অথবা ছোট্ট একটি পাথর কুচি ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তবে সেটা বহুদিন পরে মুক্তায় পরিণত হয়। কথাটা ঠিক। এই ভাবেই কিন্তু আমার জন্ম হয় সমুদ্রের তলায়।

কিন্তু এখানে একটা কথা বলে রাখি। মানুষের দল ঝিনুকের খোলার মধ্যে ওইভাবে বালুকণা কিংবা পাথর কুচি ঢুকিয়ে আমাকে তৈরি করবার আগেও তো পৃথিবীতে আমরা ছিলাম। অতএব, আমাদের জন্মের সব বাহাদুরিটাই তো মানুষের নয়! তখন আমরা আপনা থেকেই জন্মাতাম, এখনো জন্মাই। কেমন করে জানো? সমুদ্রের তলায় জলের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কখনো কখনো বালুকণা বা পাথর কুচির ক্ষুদ্র কণা হঠাৎ করে ঢুকে পড়ে ঝিনুকের শাঁসালো শরীরে। যেমন মাঠে খেলতে খেলতে হঠাৎ করে তোমাদের পায়ে কাঁটা ফুটে যায়, কিংবা এক বিন্দু কয়লার গুড়ো গিয়ে পড়ে তোমাদের চোখের মধ্যে ঠিক তেমনিভাবেই ঘটে ব্যাপারটা। আর যেই না ভেতরে আসা অমনি শুক্তির ভেতরকার পাতলা মসৃণ পদার্থ নিজে বাঁচবার জন্যে তরল পদার্থের স্তরের প্রলেপ দিয়ে, ওই বালুকণাটিকে ঢেকে ফেলে। স্তরটা হয় যেন পেঁয়াজের খোলার মতো—একটার পর একটা। ব্যাস্, এইভাবে কয়েক বছর থাকতে থাকতে ওরই মধ্যে জন্ম নেয় আসল মুক্তা, অর্থাৎ আমরা। আর মানুষেরা যা তৈরি করে, তাকে তো মানুষেরাই বলে কৃত্রিম মুক্তা।

সোনা যেমন খনি থেকে পাওয়া যায়, আমাকে তেমন ভাবে পাওয়া যায় না। আমাকে বেশি করে পেতে হলে আমার চাষ করতে হয়। এখন সারা পৃথিবীতে আমাকে পাবার জন্য ঠিক এইভাবেই কৃত্রিম মুক্তার চাষ চলেছে।

আমি জানি, তোমরা আমার কথা শুনে ভাবছ, ঝিনুকের খোলার মধ্যে বালুকণা কিংবা পাথর কুচি ঢুকিয়ে দিলেই তা থেকে মুক্তা হবে কেমন করে? তবে শোন, আমার জন্ম বৃত্তান্ত। 'শুক্তি' বলে এক ধরণের সামুদ্রিক প্রাণী আছে। এরা মেরুদণ্ডহীন, প্রায় ঝিনুকের মতো। এদের দেহ খুব কোমল এবং স্পর্শকাতর। অর্থাৎ হাত ছোঁয়ালেই শামুকের মতো গুটিয়ে যায়। শুক্তির ভেতরে থাকে পাতলা, মসৃণ এবং খুব উজ্জ্বল একরকম জিনিস। যার কথা আগে বলেছি। এটাই আমার জন্মের মূল বলতে পারো। ইংরেজিতে তাই একে বলা হয় Mother of Pearl হ্যাঁ, আমার মা-ই বটে। বাইরে থেকে ঢুকিয়ে দেওয়া জিনিস ভেতরে আসামাত্র আমার মা. অর্থাৎ ওই উজ্জ্বল তরল পদার্থ তার প্রলেপ দিয়ে বালুকণা বা পাথর কুচিটিকে স্তরে স্তরে ঘিরে ফেলে। ওই স্তরের মধ্যে অনেক দিন থাকতে থাকতেই আমার জন্ম হয়। ছিলাম ক্ষুদ্র বালুকণা বা পাথর কুচি, মায়ের গভীর মমতার আবরণে থাকতে থাকতে হয়ে গেলাম মনোহর মুক্তা।

শুনেছি আমার চাষ প্রথম করেন চীন দেশের এক ভদ্রলোক। নাম তার

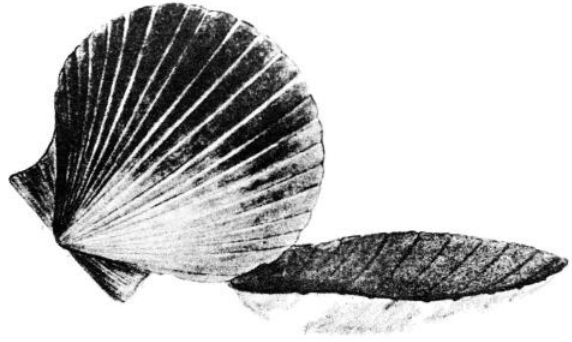

ই-জিন-ইয়াং। তবে মানুষের মধ্যে সবাই যেমন দেখতে সমান সুন্দর নয়, তেমনি আমাদের মধ্যেও দেখতে ভাল-মন্দ আছে। দেখত ভাল, গুণেও উৎকৃষ্ট এই ধরণের মুক্তা চাষের কৃতিত্ব কিন্তু এক জাপানী ভদ্রলোকের, নাম তার কোকিচি মিকিমাটো।

আমার মতে সুন্দর সুন্দর কৃত্রিম মুক্তা ভাইদের জন্মে এই মানুষটির কৃতিত্ব অনেক। হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করে মিকিমাটো বাবুর মুক্তা চাষের কারবারে। মেয়ে শ্রমিকরা করে ডুবুরির কাজ। অর্থাৎ ওরাই ডুব দিয়ে সমুদ্রের তলা থেকে তুলে আনে আমাদের। মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চলে এই কাজ। তখন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে ডুবুরির দল তাদের কাজ শুরু করে দেয়। ঘণ্টা দুয়েক কাজ তাদের। সমুদ্রের নিচে পৌঁছে ৬০ থেকে ৮০ সেকেণ্ড পর্যন্ত ডুবুরিরা থাকতে পারে। কিন্তু অতটুকু সময়ের মধ্যেই এক একজন দক্ষ ডুবুরি ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত শুক্তি তুলে আনতে পারে। আর ওই শুক্তির মধ্যেই থাকি আমরা।

মিকিমাটো বাবু যেভাবে আমাদের চাষ করেন, সেটা নিশ্চয়ই তোমাদের খুব শুনতে ইচ্ছে করছে। করবেই তো. আমি নিজেও তো কতবার শুনেছি আমার নিজেরই জন্মবৃত্তান্ত। উনি চাষ করেন এগো উপসাগরে। ওখানে একজাতীয় শুক্তিকে প্রথমে ছেড়ে দেওয়া হয়। এমন জায়গায় ছাড়া হয় যেখান-কার জল হবে অগভীর। ওই অগভীর জলে শুক্তিগুলো সমুদ্রের আগাছা, শিলা প্রভৃতির সঙ্গে নিজেদের আটকে রাখে। জুলাই—আগস্ট মাস নাগাদ শ্রমিকরা অগভীর জলে, যেখানে শুক্তি-দের ডিম পাড়ার আশা আছে, সে সব জায়গায় পাথরের টুকরো ফেলে দেয়। ডিমগুলো আশ্রয় নেয় সেই ফেলে দেওয়া পাথরের ওপর। তিন বছর পরে শিশু শুক্তিগুলো বড় হয়ে উঠলে তখন তাদের তুলে এনে অভিজ্ঞ শ্রমিকরা খুব সাবধানে তাদের খোলার মধ্যে দিয়ে বালুকণা, পাথরকুচি, এক কণা কাঠের গুঁড়ো এরকম কোন একটা বস্তু ঢুকিয়ে দেয়। তারপর আমার শুক্তি মায়েদের নিয়ে যাওয়া হয় গভীর জলে। সেখানে এক ফুট অন্তর অন্তর তাদের ছেড়ে দিয়ে আসে। আর দিনের পর দিন শুক্তি মায়েদের খোলার মধ্যে ওই তরল উজ্জ্বল স্তরের আবরণের মধ্যে থাকতে থাকতে আমরা অর্থাৎ মুক্তার দল জন্মলাভ করি। ডুবুরিরা গিয়ে আমাদেরই সংগ্রহ করে আনে। তখন শুক্তির খোল খুললেই আমাদের দেখতে পাওয়া যায়।

তাই বলে ভেবো না আমরা সমুদ্রের তলায় খুব আরামে থাকি। সমুদ্রে আমাদের শত্রুর অভাব নেই। বিশেষ করে অক্টোপাস, ওরা তো আমাদের দেখলেই গাণ্ডেপিণ্ডে ধরে খায়। তাই সমুদ্রের তলাতেও থাকতে হয় খুব সাবধানে। কতদিন থাকতে হয় জানো? প্রায় চার বছর। চার বছর পর আমাদের তুলে আনা হয়। কিন্তু এত কাণ্ড করেও শেষে দেখা যায়, একশটির মধ্যে মাত্র ৫—৬টি মুক্তা বাজারে চড়া দামে বিক্রী করার মতো। বাকী মুক্তাভাইরা প্রায় সবই নিচু ধরনের। যার অধিকাংশই অনেকটা তোমাদের বিকলাঙ্গ মানুষের মতো অকেজো। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, কত কাণ্ড করে পেতে হয় আমার মতো একদানা মুক্তামণিকে। অতএব আমার মূল্য যে মহামূল্যবান হবে তাতো জানা কথাই। দামের কথা যদি বল, তবে সারা পৃথিবীতে এখনো টেক্কা দিয়ে যাচ্ছি আমরা, অর্থাৎ আসল মুক্তার দল। রূপে কিংবা জৌলুষে আমাদের ধারেকাছে ওরা ঘেঁষতে পারে না।

অঙ্কের মজা, মজার অঙ্ক শুভঙ্কর

অঙ্কের নাম শুনলেই কেমন গায়ে জ্বর আসে। তাই না? অথচ অঙ্কের মধ্যে মজাও কিন্তু কম নেই। আর এই মজা পাবার জন্য খুব-বেশী অঙ্কের জ্ঞান না-থাকলেও চলে। সামান্য যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করতে পারাই যথেষ্ট। তা তো আমরা পারিই। তবে কিনা, অঙ্কের মূল কথা হলো, ঠিকঠিক সবকিছু করা। কখনো তাড়া-হুড়ো করতে নেই। করলে সামান্য যোগ-বিয়োগেও ভুল হয়ে যেতে পারে হঠাৎ, আর ভুল হলেই যত বিপত্তি। সুতরাং অঙ্ক কষতে গেলে চাই, একটুকরো কাগজ আর পেনসিল ; আর চাই একটু ঠাণ্ডা মাথা। কাগজ-পেনসিল নিশ্চয়ই রয়েছে। এবার ঠাণ্ডা মাথায় বসো। দু-একটা মজার অঙ্ক শেখা যাক।

একটা কাগজে বেশ বড়ো-বড়ো করে লেখো—১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ আর ৯। ভুলেও কিন্তু ৮ লিখো না। তাহলে সব মজা পণ্ড। এবার বলো, ১ থেকে ৯ এর মধ্যে কোন্ সংখ্যাটা আমার সব থেকে বেশী পছন্দ। কি বললে? ৮? বেশ ৮ই সই। আমি সঙ্গে-সঙ্গে তোমায় বলবো, পুরো সংখ্যাটাকে ৭২ দিয়ে গুণ করো। অর্থাৎ গুণের অঙ্কটা দাঁড়ালো এইরকম ঃ

১২৩৪৫৬৭৯
×৭২

করে দেখেছো? কি উত্তর হলো? ৮৮৮৮৮৮৮৮। এযে দেখছি আটের অট্টহাসি!

কি করে এমন হলো? যদি তুমি বলতে ৬? তাহলেও কি এমন হতো? নিশ্চয়ই হতো। সেক্ষেত্রে আমি শুধু বলতাম, ৭২ এর বদলে ৫৪ দিয়ে গুণ করতে। অর্থাৎ ১২৩৪৫৬৭৯×৫৪৭ উত্তর পেয়েছো? শুধু ৬ আর ৬। ছয়ের ছড়াছড়ি।

আসল কথাটা কি। তুমি যে-সংখ্যাই পছন্দ করো না, আমি শুধু মনে-মনে তাকে ৯ দিয়ে গুণ করছি। আর গুণফলটা তোমায় বলছি। অর্থাৎ তুমি যদি বলো ১, আমি বলবো ৯ দিয়ে গুণ করতে, ২ বললে ২×৯=১৮ দিয়ে গুণ করতে বলবো, এবং এইভাবে ৩ বললে ২৭ দিয়ে,..... এইভাবে ৯ বললে ৮১ পর্যন্ত চলবে।

৯ দিয়ে গুণ করতে হচ্ছে কেন? এর উত্তর আমি বলবো না। নিজেরাই মাথা খাটিয়ে বার করো।

অবে একটা কথা বলতে পারি। ৯ কিন্তু খুব মজার সংখ্যা। অঙ্কে ৯ দিয়ে যে কত মজা করা যায় তার ইয়ত্তা নেই।

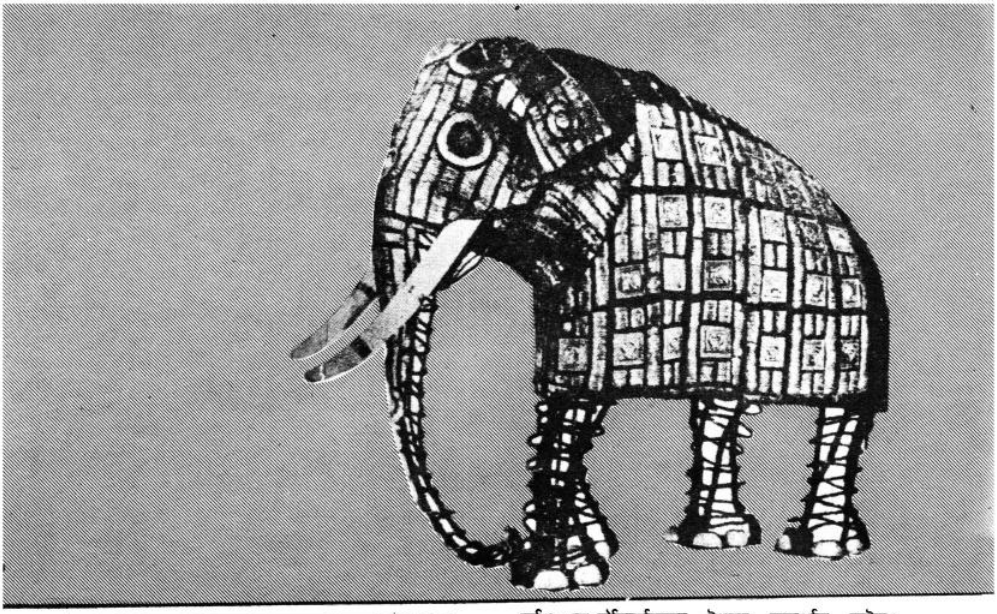

হাতির মতো দেখতে, অথচ হাতি নয়। কী হতে পারে এটা? হাতির কঙ্কাল? তুলো কিংবা খড়-ভর্তি নকল হাতি? না, সে ধরনের কিছু নয়। ছবিতে যা দেখতে পাচ্ছ আসলে তা হাতির পোষাক মাত্র। তবে অন্য ধরনের পোষাক। এই কোট প্যান্ট কাপড় কেটে তৈরী হয়নি, গড়া হয়েছিল লোহার চাদর দিয়ে। যাকে বলে—বর্ম। তাঁর ছুঁড়ে ফিরে আসবে। এমনকি বন্দুকের গুলিও সুবিধে করতে পারবে না। হাতি হেলে দুলে নিজের পথে চলতে থাকবে।

একদিন এই লোহার জামা যে বিশাল হাতিটির গায়ে শোভা পেয়েছিল সে আজ আর বেঁচে নেই। তার মালিকও বিদায় নিয়েছেন অনেক, অনেক দিন আগে। হিসেব করলে দু'শ আঠারো বছর হলো। লোকে বলে এই বর্মটি সিরাজউদ্দৌলার হাতির।

সিরাজউদ্দৌলার কথা বললেই মনে পড়ে ইংরাজের সঙ্গে তাঁর লড়াইয়ের কথা। পলাশির যুদ্ধের কথা। মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ধারে পলাশির মাঠ। এক বুক উঁচু মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা দেড় হাজার বিঘের এক আম-বাগান। লক্ষ আম গাছ সেই বাগানে। নাম তাই—লক্ষ-বাগ। এক'শ আঠারো বছর আগে এমনই এক জুন মাসে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁর সৈন্য সামন্ত নিয়ে হাজির হয়েছিলেন সেই আমবাগানে। আর তাঁর মুখো-মুখি এসে দাঁড়িয়েছিলেন ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইভ। নবাবের ইচ্ছা—বিদেশী ইংরাজদের দেশছাড়া করবেন তিনি। ক্লাইভের মতলব—নবাবকে সিংহাসন থেকে হটানো।

সেদিন বৃহস্পতিবার।

ক্লাইভের দলে ছিল নয়'শ গোরা আর দু'হাজার একশ' দেশী ভাড়াটে লড়িয়ে। আর ছিল আটটা কামান আর দু'খানা মাত্র বড় তোপ। অন্যদিকে নবাবের ছিল পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, তিপ্পান্নটি তোপ। তাছাড়া, বিস্তর হাতি ঘোড়া। তবু শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছিলেন নবাব। নিজের লোকেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে ডুবিয়ে দিল তাকে। সেই সঙ্গে গঙ্গার জলে ডুবলো আমাদের স্বাধীনতা। নয় ঘণ্টা লড়াই শেষে দেখা গেল পলাশির মাঠ ভর্তি মৃতদেহ। মানুষ তো বটেই, যত্রতত্র মরে পড়ে আছে হাতি ঘোড়া উট। এই বর্মটি নাকি সেই শ্মশানে কুড়িয়ে পাওয়া। মরা হাতির শরীর থেকে খুলে নিয়ে ক্লাইভ এটিকে চালান দিয়েছিলেন দেশে। এখনও এটি রয়েছে টাওয়ার অব লণ্ডন-এ। সাহেবরা বলে—এই বর্ম সিরাজউদ্দৌলার হাতির।

সিরাজউদ্দৌলার হাতি বটে, কিন্তু নবাব কি বর্মধারী এই হাতিটির পিঠে চড়েই হাজির হয়েছিলেন পলাশীর মাঠে? বড় হয়ে যখন খুঁটিয়ে ইতিহাস পড়বে তখন জানতে পারবে হেরে গিয়ে লড়াইয়ের মাঠ থেকে নবাব পালিয়েছিলেন উটের পিঠে চড়ে। তাঁকে ধরে বন্দী করে আনা হয়েছিল একটা ছ্যাকরা গাড়িতে করে। আর অন্যায়ভাবে তাঁকে মেরে ফেলার পর সিরাজউদ্দৌলার মৃতদেহ মুর্শিদাবাদের পথে পথে ঘোরানো হয়েছিল একটা হাতির পিঠে চড়িয়ে। কে জানে, এই লোহার জামাটি সেই হাতিরই গায়ে ছিল।

শ্রীপান্থ

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

গোয়েন্দার নাম গোগো

মেজাজটা রীতিমতন খারাপ হয়ে রয়েছে গোগো-র।

তার ছোটকাকার সঙ্গে কতখানিই বা বয়সের তফাৎ গোগো-র? তবু যেহেতু ছোটকা কলেজে পড়ে, কলেজের দলের সঙ্গে একা দারজিলিং বেড়াতে গেছে। আর গোগো? যেহেতু স্কুলের চৌকাঠ পেরুতে এখনও তার দু-বছর বাকি; অতএব কলকাতার ভ্যাপসা গরমে পচছে। একা হাওড়া ব্রিজ আসার অধিকার পর্যন্ত তার নেই। তাহলেই হৈ-হৈ পড়ে যাবে বাড়িতে। শুধু রোদে ঘামতে ঘামতে রোজ স্কুলে যাও আর ফিরে এসো। ফিরে এসে ছোটকার চিঠিতে পড়ো, দারজিলিং-য়ে আ-হ, কী-রকম ঠাণ্ডা! টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয়ের দৃশ্য কী ম্যাগনিফিসেণ্ট! তেনজিং নোরকের সঙ্গে কীভাবে আলাপ করেছে ছোটকা, আর সেই আলাপে তেনজিং নোরকে এতই ইমপ্রেসড্ যে নিজে পাহাড়ে-চড়া শেখাতে চেয়েছে ছোটকাকে!

শুধু ওই সবই যদি লিখত ছোটকা তবু সহ্য হোত! গোগোর মনের ঘা-য়ে নুনের ছিটে দিতে সেই সঙ্গে প্রতি চিঠিতে একা-একা কোনো গোয়েন্দাগিরি না-করতে যদি না উপদেশ দিত! গোগো যেহেতু স্কুলে পড়ে অতএব ছেলেমানুষ, অতএব একা কোথায় কোন্ বিপদে প'ড়ে যাবে ব'লে সাবধান না-করত!

ছোটকার এই সাবধানতা কী জন্যে সেটা অবশ্য গোগো বোঝে। না-বোঝার মতন বোকা বা খোকা সে নয়। ছোটকা ছাড়াই একটা কোনো রহস্যের কিনারা যদি গোগো ক'রে ফালে, সেইটাই আসলে ভয় ছোটকার। তাহলে ছোটকার আর মুখ থাকবে না কারুর কাছে। আর স্কুলে পড়ে অতএব ছেলেমানুষ ব'লে গোগোর উপর হামবড়াইও বন্ধ হয়ে যাবে।

আর ভগবানও তেমনি। গোগোর বাড়ির লোকজনদের মতনই ইস্কুলে-পড়া ছেলেদের প্রতি সমান অবুঝ আর নিষ্ঠুর। নইলে ছোটকা দারজিলিংয়ে থাকতে থাকতে তেমন একটা গভীর রহস্যময় ঘটনা কি ঘটতে পারে না যা গোগো অক্লেশে সমাধান করে ফেলতে পারে! স্কুলে যাতায়াতের পথে কিম্বা বিকেলে যখন গোগোর খেলার ছুটি—সেই সময়ের মধ্যে! অন্য সময় তো আর বাড়ি থেকে তার বেরুনোর উপায় নেই! হে ভগবান, তুমি তো সব পারো! দাও না একটা তেমন রহস্যের ব্যবস্থা করে! তেনজিং নোরকের কাছে পাহাড়ে-চড়া শেখার মজাটা তাহলে বেরিয়ে যায় ছোটকা-র।

কী করে বুঝি কথাটা ভগবানের কানে পৌঁছেছিল। আর শুধু তেমন একটা রহস্যের ব্যবস্থা নয় সেই সঙ্গে হঠাৎ একটা ছুটির দিনের ব্যবস্থা এবং কারুকে কোনো কৈফিয়ত না দিয়ে অসময়ে বাড়ি থেকে গোগোর বুক ফুলিয়ে বেরুনোর ব্যবস্থা পর্যন্ত হয়ে গেল।

হঠাৎ ছুটির ব্যবস্থাটা হয়ে গেল মহাবীরের আড়াই হাজারতম জন্মদিন উপলক্ষে। তা ছুটি তো কী? স্কুলেই শুধু যেতে হবে না, সকালবেলার পড়া থেকে তো আর গোগোর ছুটি নেই। সকালের জলখাবার খেয়ে গোগা উঠে তাই চারতলায় তার পড়ার ঘরে যাচ্ছিল, সিঁড়িতে মেজকা-র সঙ্গে দেখা। তাড়াহুড়ো ক'রে মেজকা কোথায় যেন বেরুচ্ছেন, গোগোকে দেখে সিঁড়ি জুড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আর, কী যেন ভাবতে লাগলেন গোগোর মুখের দিকে তাকিয়ে।

হাইকোর্টের নামজাদা উকিল মেজকা। কী হ'ল, কী ঘটল হঠাৎ তাঁর গোগোর মুখের দিকে ও-ভাবে তাকিয়ে ভাববার?

ভেবে কী যেন স্থির করলেন মেজকা। জিগ্যেস করলেন—'আজ তো তোর স্কুল ছুটি?"

গোগো ঢোঁক গিলে বলল—'হ্যাঁ।'

'তবে চট করে জামা পরে আয়। আমার সঙ্গে যাবি এক জায়গায়।'

'কোথায়?' অনেকটা ঢোক গিলে গোগো বলল, 'মানে, কী রকম জামা-কাপড় পরব?'

'আমার এক মক্কেলের বাড়ি। একটা রহস্যময় চুরি হয়েছে সেখানে। ছোট্টো

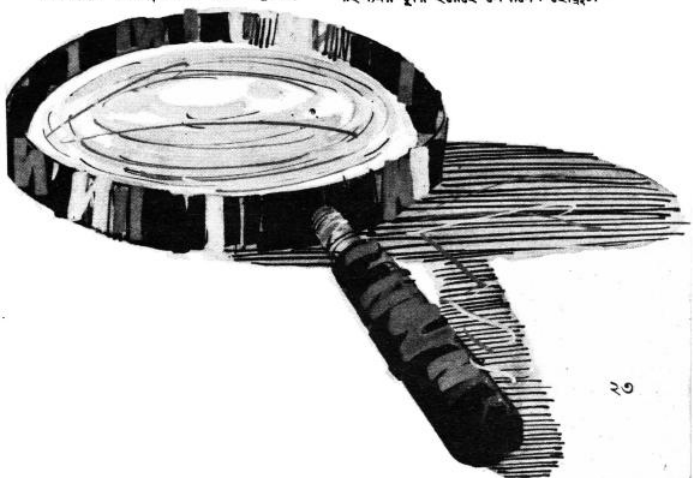

থাকলে ওকেই নিয়ে যেতাম। যা, চটপট কর।'

কী শুনছে গোগো? ঠিক শুনছে তো কানে। ছোটু মানে ছোটকা আর গোগো মিলে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়ায়, মেজকা সেটা জানে। আর সেই সঙ্গে যেটা মেজকা ভাবে সেটা হল সেইসব গোয়েন্দাগিরির আসল কৃতিত্ব ছোটকার। ধারণাটা যে কত ভুল, সেটা যদি আজ গোগো প্রমাণ করে দিতে পারে! হে ভগবান, আমার কথা যখন শুনেছো, ছোটকা না-থাকার সময় একটা রহস্যের ব্যবস্থা যখন করেইছো তখন বাকিটা মানে সমাধানের ব্যবস্থাটাও কোরো!

মেজকা গাড়িতে গিয়ে বসেছিলেন। গোগো গিয়ে পাশে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। মেজকা বললেন—'ঘটনাটা এখন পর্যন্ত আমি যেটুকু জানি, মানে, মিঃ বিলমোরিয়া ফোনে যেটুকু বললেন, শুনে নে। বাকিটা ওঁর কাছে গিয়ে শুনবি।'

'মিঃ বিলমোরয়া, মানে পার্শী?'

'হ্যাঁ। কলকাতা শহরের একজন বড় হীরের ব্যবসাদার। কাল সন্ধ্যেবেলা ওঁর একজন পুরনো খদ্দের একটা হীরে যাচাই করার জন্যে ওঁর বাড়িতে নিয়ে আসে—'

'বাড়িতে কেন? ওঁর দোকান নেই?'

'আছে। বেশ বড় দোকান। আমি সেই দোকানে অনেকবার গিয়েছি। খদ্দেরটির বাড়িতে আসার কারণ দোকান তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আজও আবার বন্ধ। অথচ আগামী কাল সকালে খদ্দেরটি আবার বম্বে চলে যাবে বিশেষ কাজে। তাই খদ্দেরটিকে বাড়িতে আসতে বলেছিলেন মিঃ বিলমোরিয়া। তারপর যথাসময়ে খদ্দেরটি এসেছিল, হীরেটি দেখিয়েছিল। হীরেটি মাপে খুব বড় নয় কিন্তু এত ভালোজাতের যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম হবে। তবে সে-রকম দাম কবুল করার আগে মিঃ বিলমোরিয়া হীরেটিকে আরো ভালো করে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তাই খদ্দেরটিকে বলেছিলেন হীরেটি তাঁর কাছে রেখে যেতে আর আজ সকাল দশটায় আসতে।'

'তারপর?'

'রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মিসেস বিলমোরিয়া শুয়ে পড়েন আর সেই ঘরে বসেই মিঃ বিলমোরিয়া ঘুমোবার আগে হীরেটি আবার পরীক্ষা করতে বসেন। পরীক্ষা করে বোঝেন হীরেটি এত ভালো যে সত্তর হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া চলে। তারপর হীরেটি লোহার আলমারিতে তুলে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে ঘুম ভাঙার পর দেখেন মিসেস বিলমোরিয়া যথারীতি নিচে কিচেন-এ নেমে গেছেন। তারপর রোজকার অভ্যেসমতন মিঃ বিলমোরিয়া বাথরুমে স্নান এবং বাথরুম থেকে তার লোহার আলমারি খোলার আওয়াজ পান। যেহেতু মিসেস বিলমোরিয়ার তখন উপরে উঠে আসার কথা নয়, তাই মিঃ বিলমোরিয়া সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসেন আর দেখেন আলমারি খোলা, হীরের কৌটোটি উধাও। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসেন কিন্তু কাউকে দেখতে পান না। ওঁর তিন ভাইপো ওঁর সঙ্গে থাকে, তাদের ঘরে গিয়ে দেখেন তারা তিনজনই ঘরে রয়েছে—'

'মিসেস বিলমোরিয়া আর ঐ তিন ভাইপো ছাড়া আর কে থাকে বাড়িতে?'

'বেয়ারা, খানসামা, ড্রাইভার। পুরনো বিশ্বাসী লোক তিনজনই। তার মধ্যে ড্রাইভার সেই সময়ে বাজারে গিয়েছিল আর খানসামা আর চাকর নিচে কিচেন-এ তাঁর কাছে ছিল বলে মিসেস বিলমোরিয়া বলছেন।'

'ঐ ক-জন ছাড়া আর বাড়িতে কেউ ছিল না?'

'না। একটি মাত্র মেয়ে রয়েছে মিঃ বিলমোরিয়ার। বিয়ে হয়ে বম্বেতে থাকে।'

'সন্দেহটা তাই তিন ভাইপোর উপর?'

'হ্যাঁ। যতদূর মিঃ বিলমোরিয়ার কাছে শুনেছি, লোক তিনজনের কেউই সুবিধের নয়। তিনজনের একজনকেও মিঃ বিলমোরিয়া দেখতে পারেন না। মিঃ বিলমোরিয়া অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ পার্শী। কিন্তু তিন ভাইপোই চেন স্মোকার। অথচ পার্শীদের দেবতা হল আগুন—তাই ধূমপান একটা মস্ত অপরাধ।'

গোগো জানতো না ব্যাপারটা, অবাক হয়ে শুনল। তারপর কোনো প্রশ্ন করার আগেই দেখল গাড়িটা একটা বাগান-ওয়ালা বাড়ির মধ্যে ঢুকছে। তাড়াতাড়ি মেজকা-কে জিগ্যেস করল—'পুলিশে খবর দিয়েছেন মিঃ বিলমোরিয়া?'

'এখনও দেননি। তবে ব্যাপারটা তো এখনও ঘণ্টাখানেকের বেশী হয়নি। পুলিশে খবর দেবার সময় যায়নি। মিঃ বিলমোরিয়ার যেটা বড় চিন্তা এখন সেটা হল দশটার সময় সেই খদ্দের তাঁর হীরে ফেরত নিতে এলে তিনি কী করবেন। আর সেই পরামর্শের জন্যই আমাকে ফোন করেছেন।'

মেজকা-র আসার খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতেই বুঝি নিচে নেমে এলেন মিঃ বিলমোরিয়া। ষাটের উপর বয়েস, শুকনো চেহারা। আরো বেশী শুকিয়ে গিয়েছেন বোধহয় এই চুরির ঘটনায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বসার ঘরে ঢুকলেন আর তারপর চেয়ারে বসে মেজকা-কে বললেন—'যাক, আপনি এসে গিয়েছেন। এবারে বলুন মিঃ মুখার্জি, আমি কী করব?'

মেজকা বললেন—'বলছি। তার আগে আমার ভাইপো গোগো-র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেই।'

মিঃ বিলমোরিয়া সখেদে বললেন—'বেচারাকে আজ কেন আনলেন? অন্য একদিন আনলে ওকে আমি অনেক হীরের গল্প শোনাতে পারতাম। তা, এনেছেন যখন, ও তখন বরঞ্চ একটু গিয়ে বাগানের ফুল দেখুক।'

মেজকা বললেন—'না, এখানেই বসুক। হ্যাঁ, আপনি কী করবেন আমায় জিগ্যেস করছিলেন—'

'হ্যাঁ। বলুন, আমার সেই খদ্দেরের আসার সময় হয়ে এল। কী বলব তাকে?'

'হীরেটা যদি ফেরত দিতে পারেন তাহলে কী বলবেন সেটা নিশ্চয়ই আমাকে জিগ্যেস করছেন না—'

'না। কিন্তু হীরেটা ফেরত দিচ্ছি কোত্থেকে?'

'চুরির ঘটনার পর আপনার বাড়ি থেকে কেউ কি বাইরে গিয়েছে?'

'না। আমার মেজভাইপো রুসি বেরুতে যাচ্ছিল, আমি বেরুতে দেইনি।'

'তাহলে যেই চুরি করে থাকুক, হীরেটা এখনও এই বাড়িতেই আছে। আপনার আলমারি থেকে খোয়া গেলেও বাড়ি থেকে খোয়া যায়নি।'

শুনে মিঃ বিলমোরিয়া উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন—'আমি কি সেটা ভাবিনি মনে করছেন? এতক্ষণ হোমি, রুসি আর জাল—আমার তিন ভাইপোর ঘর আমি তন্ন তন্ন করে তল্লাশ করছিলাম—জানেন?'

মেজকা হেসে বললেন—'শুধু তাঁদের ঘর নয়, সেইসঙ্গে তাদের শরীরও যে তন্ন তন্ন করেছেন, বুঝতে পারছি। আরো বুঝতে পারছি—ফল তাতে কিছু হয়নি। কেননা, যে-ই হীরেটি চুরি করে থাকুক, ধরা পড়ার জন্যে নিজের ঘরে বা কাছে কখনই সে রাখবে না!'

মিঃ বিলমোরিয়া অধৈর্য হয়ে বললেন—'তাহলে কোথায় রাখতে পারে আমায় বলুন? আমি আবার খুঁজে

দেখি—'

মেজকা বললেন—'তার আগে হীরের সাইজটা আমাকে একটা কাগজে এঁকে দেখান।'

সঙ্গে সঙ্গে টেবিল থেকে কাগজ কলম নিয়ে মিঃ বিলমোরিয়া এঁকে ফেললেন। মেজকার হাতে কাগজটা দিতে গোগো ঝুঁকে দেখল—আকারে একটা মটরদানার মতন। কাগজটা দেখতে দেখতে মেজকা বললেন—'এবার বলুন, ওই হীরেটি যে কাল রাতের জন্যে আপনার কাছে থাকছে, এ-কথা আপনি ছাড়া আর কে কে জানতো?

মিঃ বিলমোরিয়া বললেন—'রাতে খেতে বসার আগে ড্রয়িংরুমে বসে হীরেটি আমার স্ত্রীকে আমি যখন দেখাই আমার তিন ভাইপোই সেখানে উপস্থিত ছিল।'

'চাকরবাকরদের কেউ তখন ঘরে এসেছিল?

'না।'

'অর্থাৎ, আপনাকে ও আপনার স্ত্রীকে বাদ দিলে মোট তিনজন—আপনার তিন ভাইপো শুধু জানতো যে হীরেটি রাতে বাড়িতে থাকছে।'

'হ্যাঁ।'

গোগো মনে মনে মাথা নেড়ে বলল—তিনজন নয়, চারজন। যে খদ্দের হীরেটি দিয়ে গিয়েছিল, খবরটা সে-ও জানতো!

মেজকা আবার প্রশ্ন শুরু করলেন—'আপনার ভাইপোদের তিনজনেরই নিশ্চয় হীরে-জহরত সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান রয়েছে?'

মিঃ বিলমোরিয়া জবাব দিলেন—'কিছু তো থাকার কথা। একসময় তিনজনই আমার সঙ্গে দোকানে বেরুতো।'

'এখন আর বের হয় না?'

'না, এ-ব্যবসায়ে তিনজনের কারুরই কোনো উৎসাহ নেই দেখে আমি ওদের অন্য কাজকর্ম দেখতে বলে দিয়েছি। প্রত্যেককে টাকাও দিয়েছি সেইজন্যে।

'কী করে এখন তারা?'

'বড় ভাইপো হোমি সেই টাকা নিয়ে একটা হোটেল খুলেছিল, চলেনি। আবার টাকা চাইছে আমার কাছে অন্য ব্যবসা করবে বলে।'

'মেজ ভাইপো রুসি?'

'সে টাকা নিয়ে বম্বে গিয়েছিল সিনেমা তুলতে। সব টাকা খুইয়ে তারপর ফিরে এসে বাড়িতে বসে আছে।'

'আর টাকা চায়নি?'

'না। হোমিকে দেইনি দেখেই বোধহয় চায়নি।'

'আর ছোটজন? যার নাম জাল?'

'সে টাকা নিয়ে সোজা ইংল্যাণ্ডে চলে গেল। কী করল সেখানে জানি না। তারপর বছরখানেক হল ফিরে এসে আবার টাকা চাইছে জাপানে গিয়ে মোটরগাড়ি তৈরি শিখবে বলে।'

'অর্থাৎ, তিনজনেরই টাকার খুব প্রয়োজন।'

'হ্যাঁ।'

গোগো মনে মনে বলল—'টাকার প্রয়োজন সকলেরই। যার আছে, যার নেই—দু-জনেরই। তবে অসাধু যে সেই শুধু চেষ্টা করে চুরি, বাটপারি করবার।

মেজকা আবার আরেক দফা প্রশ্ন শুরু করলেন—'আচ্ছা, হীরেটি আলমারি থেকে উধাও দেখেই তো আপনি ঘর থেকে বেরিয়ে তখনই তিন ভাইপোর ঘরে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'গিয়ে কাকে কী অবস্থায় দেখলেন?'

'প্রথমে গিয়েছিলাম জাল-এর ঘরে। গিয়ে দেখলাম সে ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়ছে আর হাতে সদ্য-ধরানো একটা সিগারেট জ্বলছে। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি সেটা বইয়ের আড়ালে লুকোলো।'

'তারপর কার ঘরে গেলেন?'

'তারপর মেজ ভাইপো রুসির ঘরে। সে দেখলাম তার তামাক খাওয়ার পাইপটা পরিষ্কার করে তাতে তামাক ভরছে। আমাকে দেখে পাইপটা তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে ফেলল।'

'তারপর বড় ভাইপো-র ঘরে গিয়ে কী দেখলেন?'

'সামনে খালি চায়ের কাপ তার হাতে খবরের কাগজ, মুখে চুরুট। দরজা থেকে মুখ ফিরিয়ে জানলার কাছে বসেছিল সে। আমার পায়ের শব্দে মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালো আর চুরুটটা ফেলে দিল তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে।'

মনের মধ্যে হিসেব টুকে নিল গোগো—তিন ভাই ধূমপান করে। বড় হোমি—চুরুট, মেজ রুসি পাইপ, ছোট জাল—সিগারেট। তারপর মেজকাকে ফিসফিস করে বলল—'কোন্ ঘরের কোন্ আলমারি থেকে চুরি গেছে সেটা একবার দেখা দরকার।'

মিঃ বিলমোরিয়া-র কান খুবই সতর্ক। সঙ্গে সঙ্গে জিগেস করলেন—'কী বলছে আপনার ভাইপো?'

মেজকা হেসে বললেন—'খুব ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে তো। তাই বলছে—কোন্ জায়গা থেকে চুরি হয়েছে সেটা দেখা দরকার। তা, কথাটা ঠিকই বলেছে। চলুন, জায়গাটা দেখি—'

মিঃ বিলমোরিয়া চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে গোগোর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—'ভেরি ব্রাইট বয়, তারপর মেজকা-কে বললেন—'চলুন—'

মিঃ বিলমোরিয়ার পিছন-পিছন তার বাংলো প্যাটার্নের দোতলা বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সিঁড়ির দু-পাশে সাজানো ফুলের টবগুলি লক্ষ্য করল গোগো। ঐ মটরদানা মাপের একটা হীরে কত সহজেই না এই ফুলের টবগুলির মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়। কিম্বা বাইরের বাগানে অত যে ফুলের গাছ, তার যে কোনো একটার তলার মাটি খুঁড়ে। যে লুকোবে, তার নিশানা তাতে ঠিকই থাকবে কিন্তু অন্যের পক্ষে খুঁজে পেতে হলে সবগুলি টব বা গাছের গোড়া খুঁড়ে দেখতে হবে।

সিঁড়ির শেষে দোতলায় প্রথমে একটা ল্যান্ডিং বা ঢাকা জায়গা। তারপর একটা করিডোর আর সেই করিডোরের দু-পাশে পর পর ঘর। মিঃ বিলমোরিয়া হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন—'বাঁ-দিকের প্রথম ঘরটা আমার বেডরুম যেখান থেকে আজ ভোরে হীরেটি খোয়া গেছে।'

মেজকা বললেন—'ডানদিকের প্রথম ঘরটায় কে থাকে?'

'কেউ না—ওটা ড্রয়িংরুম।'

'আপনার ছোট ভাইপো জাল কোনটায় থাকে?'

'ড্রয়িংরুমের পর ডানদিকের দ্বিতীয় ঘরটায়। তারপর তৃতীয় বা শেষ ঘরটায় রুসি।'

'আর বড় ভাইপো হোমি?'

'বাঁ-দিকের শেষ ঘরটায় অর্থাৎ রুসির উল্টোদিকে।'

আর বাঁ-দিকের দ্বিতীয় ঘরটায়? মানে, আপনার আর হোমির ঘরের মাঝখানের ঘরটায়?'

'জাল-এর ঘরের উল্টোদিকে ওটা ডাইনিং-রুম। ওই ঘরটা থেকেই দরজা রয়েছে ও-পাশের খোলা ছাদ বা বারান্দায় যাবার।'

অর্থাৎ, গোগো মনে মনে হিসেব করে নিল, যে-গাড়িবারান্দার তলায় এসে ওরা গাড়ি থেকে নেমেছিল, তারই উপরের বারান্দা।

'এক সেকেন্ড দাঁড়ান!' বলে মিঃ বিলমোরিয়া পর্দা সরিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে গেলেন। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এসে বললেন—আসুন।

ঘরের মধ্যে ঢুকতেই একজন প্রৌঢ়া মহিলা গুড মর্নিং বলে অভ্যর্থনা জানালেন। মিঃ বিলমোরিয়া আলাপ করিয়ে দিলেন—'আমার স্ত্রী। আর ইনি আমাদের ল-ইয়ার মিঃ মুখার্জি। সঙ্গে ব্রাইট ছেলেটি মিঃ মুখার্জির ভাইপো।'

স্বামীর কাছাকাছি বয়েস মিসেস বিলমোরিয়ার। তবে চেহারা অত শুকনো নয়। মেজকা-কে বললেন—'যাক, আপনি এসে গেছেন। সকাল থেকে ওকে বলছি পুলিশে খবর দিতে, তা ও বলছে আপনি এলে পর পরামর্শ করে যা করার করবে।'

মেজকা বললেন—'হ্যাঁ, আগে ব্যাপারটা একবার নিজেরা আমরা বুঝেনি।'

মিসেস বিলমোরিয়া বললেন—'যাই, ততক্ষণ আমি আপনাদের জন্যে একটু চায়ের ব্যবস্থা করিগে।'

মিসেস বিলমোরিয়া চলে গেলেন। ইতিমধ্যে গোগো ঘরটা ভালো করে দেখে নিয়েছে, এঁকে নিয়েছে মনে।

প্রথমে জানলা-দরজা। ঘরের দরজা দুটো। একটা যেটা দিয়ে তারা ঘরে ঢুকেছে এবং মিসেস বিলমোরিয়া বেরিয়ে গেলেন। অন্য দরজাটা ঘরের বাঁ-দিকে—নিশ্চয়ই বাথরুমের, সেখান থেকে তাঁর আলমারি খোলার আওয়াজ পেয়েছিলেন মিঃ বিলমোরিয়া। জানলাও ঘরের দুটো—একদিকে। ঘরে ঢোকার দরজার উল্টোদিকে গাড়িবারান্দার দিকে।

তারপর আসবাব। জোড়াখাট পাতা রয়েছে ঘরের মাঝখানে। বাঁ-দিকের দেওয়ালে ড্রেসিং টেবিল। জানলা-দুটোর গায়ে ডিভান, ডানদিকের দেওয়ালে ওয়ার্ডরোব আর স্টিলের একটা আলমারি জানলার উল্টোদিকের দেওয়ালে, ঘরে ঢোকার দরজার ডান-পাশে। আলমারিটার পাল্লা খোলা অর্থাৎ মিঃ বিলমোরিয়ার, যেটা থেকে হীরেটি খোয়া গেছে। শুধু তাই নয়, কাল রাতে যখন মিঃ বিলমোরিয়া ওই আলমারিতে হীরেটি তুলে রাখছেন তখন জানলার বাইরে অন্ধকার গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে-কেউ সে-দৃশ্য দেখে থাকতে পারে। যে-কেউ বলতে তাঁর ভাইপোদের যে-কেউ।

মিঃ বিলমোরিয়া-র সঙ্গে গিয়ে মেজকা পাল্লা খোলা স্টীলের আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। গোগো লক্ষ্য করল—জামাকাপড় আর জিনিসে ঠাসা। মেজকা সেগুলি দেখতে দেখতে বললেন—'চুরির পর আলমারি আর বন্ধ করেননি দেখছি—'

মিঃ বিলমোরিয়া বললেন—'আমার স্ত্রী বলেছেন পুলিশ না-আসা পর্যন্ত যা যেমন রয়েছে তেমনি রেখে দিতে।'

'ঠিকই বলেছেন। আচ্ছা, এই আলমারিতে দামী জিনিস মানে হীরে-জহরৎ আর কিছু ছিল?'

'না। আমার ব্যবসা কাঁসের. এ-পাড়ার সবাই জানে। যা দিনকাল. বাড়িতে কখনও ও-সব আনি না। কালকের ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল।'

'হীরেটি কোথায় রেখেছিলেন?'

'দ্বিতীয় তাকে—' মিঃ বিলমোরিয়া আঙুল দিয়ে দেখালেন—বাঁ-দিকে ওই জামাকাপড়ের ভাঁজে।'

'ওইখানেই কি আপনি সাধারণত টাকা কড়ি বা প্রয়োজন পড়লে দামী জিনিসপত্তর রাখেন?'

'না, তার কোনো ঠিক নেই। ওই দেখুন না, আমার মাণি-ব্যাগটা উপরের তাকে একেবারে চোখের সামনে রাখা রয়েছে।'

'ব্যাগটা তো নেয়নি দেখছি। কত টাকা ছিল আপনার ব্যাগে?'

'চারশো মতন—'

'আর কোনো টাকা রয়েছে কোথাও?'

'না।'

আলমারিতে গোগোর যা দেখবার, দেখা হয়ে গিয়েছিল। ফিস ফিস করে মেজকা-কে বলল—'ওই গাড়ি বারান্দায় গিয়ে জানলাদুটোর বাইরেটা একবার দেখা দরকার।'

ভুরু কুঁচকে মেজকা বললেন—'কেন?'

'বেশ তো। চলুন না—'

মিঃ বিলমোরিয়ার পিছন-পিছন ঘর থেকে বেরিয়ে এল গোগো আর মেজকা। তারপর করিডোর ধরে এগিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকল। ঢোকার আগে ডানদিকের ঘরের দিকে একবার আড়-চোখে দেখে নিল গোগো। পরদার ফাঁক দিয়ে দেখল ইজিচেয়ারে বসে রয়েছে একজন যুবক মানে জল। হাতে বই কিন্তু চোখ বইতে নয়। তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রয়েছে গোগোদের দিকে।

ডাইনিং রুমের অন্য দরজা দিয়ে গাড়িবারান্দায় বেরিয়ে এসে গোগো লক্ষ্য করল গাড়ি বারান্দায় যাতায়াতের দরজা শুধু ওইটাই। মিঃ বিলমোরিয়ার ঘরের মতন অন্য ঘরগুলিরও শুধু দুটো করে জানলা রয়েছে গাড়ি-বারান্দার দিকে।

মিঃ বিলমোরিয়ার ঘরের জানলা দুটোর কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো গোগো—একটা পোড়া দেশলাই-এর কাঠি পড়ে রয়েছে একটা জানলার কাছে। নিচু হয়ে কাঠিটা তুলে নিল গোগো। তারপর যা করল, হাঁ-করে তা দেখতে লাগলেন মেজকা আর মিঃ বিলমোরিয়া।

পকেট থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে সেই জায়গার মেজেটা পরীক্ষা করতে লাগল গোগো। হামাগুড়ি দিয়ে ওই জানলার পাশের মেঝের প্রতিটি ইঞ্চি। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়ালো।

মেজকা জিজ্ঞেস করলেন—'কিছু পেলি?'

গোগো হাসিমুখে বলল—'না। চলো, আমার কাজ হয়ে গিয়েছে।'

'কিছুই তো পেলি না, বলছিস—'

'এই পোড়া দেশলাইয়ের কাঠিটা পেয়েছি—আর কিছু নয়।'

মিসেস বিলমোরিয়া চা-সাজিয়ে বসেছিলেন ড্রয়িংরুমে। আর সকলের জন্যে চা, গোগোর জন্যে কোকো। সেই কোকোর কাপে একটা চুমুক দিয়ে গোগো মিঃ আর মিসেস বিলমোরিয়ার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল—'আজ বা কাল, আপনাদের দু-জনের মধ্যে কেউ কি ধূপ বা কোনো কিছু জ্বালিয়ে একটা দেশলাইয়ের কাঠি আপনাদের ঘরের জানলার বাইরে ফেলেছেন?'

মিঃ বিলমোরিয়া বললেন—'আমি ফেলিনি।'

মিসেস বললেন—'আমিও না। কেন?'

গোগো বলল—'আপনাদের ঘর যে-রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাতে ও-রকম অভ্যেস আপনাদের থাকার কথা নয়। তবু সাবধানের মার নেই। যাক, হীরেটি তাহলে কে চুরি করেছে, সেটা জানা গেল।'

মেজকা বললেন—'বলিস কী? কে?'

মিঃ বিলমোরিয়া উত্তেজিত হয়ে বললেন—'কে? শিগ্‌গীর বলো—'

মিসেস বিলমোরিয়া হাঁ-করে তাকিয়ে রইলেন গোগোর মুখের দিকে।

গোগো বলল—'হীরেটি চুরি হয়েছে খুবই তাড়াতাড়ি, কেননা আলমারি খোলার আওয়াজ পেয়েই মিঃ বিলমোরিয়া বেরিয়ে এসেছিলেন। অত অল্পসময়ের মধ্যে ওই আলমারি ঘেঁটে চোরের পক্ষে হীরেটি খুঁজে পাওয়া কখনই সম্ভব হোত না যদি হীরেটি আলমারির কোন্ তাকে কোথায় রাখা রয়েছে সেটা চোরের আগে থেকে দেখা না-থাকত।'

মেজকা ঘাড় ঝুঁকিয়ে সায় দিলেন। মিঃ বিলমোরিয়া বললেন—'রাইট।' মিসেস বিলমোরিয়া হাঁ-করে শুনতে লাগলেন।

কোকোর কাপে আরেকটা চুমুক দিয়ে নিয়ে গোগো বলতে শুরু করল—'মিঃ বিলমোরিয়া আলমারিতে হীরেটি তুলে রেখেছিলেন কাল রাতে। কোন্ তাকে, কোথায় সেটা তার আগে কার্ পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। আলমারি বন্ধ হওয়ার পরেও নয়। দেখতে হলে চোরকে সেইসময়ে অর্থাৎ হীরেটি রাখার সময়ে দেখতে হয়। আর, দরজা বন্ধ ঘরে সেই দৃশ্য তাকে দেখতে হলে দেখতে হয় জানলার বাইরে ওই গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলে তাকে দেখতেও পাচ্ছে না কেউ।'

আবার সায় দিলেন মেজকা। মিঃ বিলমোরিয়া আবার বললেন—'রাইট।' মিসেস বিলমোরিয়া আরো হাঁ-করে শুনতে লাগলেন।

গোগো আবার বলতে শুরু করল—'মিঃ বিলমোরিয়া হীরেটি কোথায় রাখেন সেটা দেখার জন্যে চোরকে ওইখানে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল আর সে-সময়ে সে যে ধূমপান করেছিল, এই পোড়া দেশলাইয়ের কাঠিটাই তার প্রমাণ। এই কাঠিটা ওইখানে পড়ে থাকার অন্য কোনো কারণ নেই। অর্থাৎ, চোর ধূমপান করে এবং সে আপনার একজন ভাইপো।'

মিঃ বিলমোরিয়া একটু হতাশ হয়ে বললেন—'আমার ভাইপোদের একজন সে তো আমি গোড়া থেকেই জানি। কিন্তু কোন্ জন?'

গোগো হেসে বলল—'জানলার বাইরে শুধু এই পোড়াকাঠিটা পাওয়া গেছে, আর কিছু নয়। তাতেও কি আপনি বুঝতে পারছেন না তিনজনের কোন্ জন?'

মিঃ বিলমোরিয়া বিরক্ত হয়ে বললেন—'কী করে বুঝব?'

'আপনার ভাইপোদের মধ্যে একজন চুরুট খায় আপনি জানেন?'

'হোমি খায়। তাকে কী?'

'অন্য একজন পাইপ খায়?'

'সে রুসি। তাতেই বা কী?'

'আরেকজন সিগারেট খায়?'

'জাল। ত'তেই বা কী হচ্ছে?'

হতাশ হয়ে মেজকা-র দিকে তাকালো গোগো। মেজকা-ও গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লেন। মিসেস বিলমোরিয়া অবাক বিষ্ময়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন গোগোর মুখের দিকে।

গোগো হেসে বলল—'তবে শুনুন—চোর আপনার যে ভাইপো পাইপ টানেন, তিনি। অন্য দু-জনের একজন চুরুট খান, অনাজন সিগারেট। তারা হলে কিছু ছাইও পাওয়া যেত জানলার বাইরে। সে-ছাই এমনি চোখে দেখা না-গেলেও আমার ম্যাগনিফাইং গ্লাসে নিশ্চয় কিছুটা দেখা যেত। গুঁড়ো ছাই এমনকি ছাই রঙের কিছুটা ধুলো নিশ্চয়ই জানলার বাইরে যেখানে পোড়া-কাঠিটা পড়েছিল, তার আশপাশে আমি দেখতে পেতাম। একমাত্র চোর যদি পাইপ খায় তাহলে সে-রকম কিছু না-পাওয়া সম্ভব।'

মিঃ বিলমোরিয়া উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—'রাইট। তার মানে রুসি।' আর বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, ছুটে যেতে চাইলেন রুসি-র ঘরে।

গোগো বলল—'দাঁড়ান। চোর যে আপনার পাইপটানা ভাইপো রুসি তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু তাকে গিয়ে বললেই বা ধমকালেই কি সে অপরাধ স্বীকার করবে, হীরেটি ফেরত দেবে?'

মিঃ বিলমোরিয়া গর্জে উঠলেন—'আমি ওকে পুলিশে দেবো।'

গোগো হেসে বলল—'তা যদি পারতেন তাহলে আমার কাকাকে না-ডেকে আপনার স্ত্রীর কথা মতন প্রথমেই পুলিশ ডাকতেন।'

মিঃ বিলমোরিয়া যেন নিভে গেলেন। চুপসে বসে পড়লেন চেয়ারে।

গোগো জিগেস করল—'আপনার পুলিশ না-ডাকার কারণটা কি আমি বলবো?

মিঃ বিলমোরিয়া কোনো উত্তর দিলেন না। মিসেস বিলমোরিয়া সাগ্রহে বললেন—'বলো, আমি জানতে চাই।'

'মিঃ বিলমোরিয়া যদি তাঁর খদ্দেরের ওই হীরেটা স্মাগল্‌ড্‌ বা চোরাই নয় ব'লে নিশ্চিত থাকতেন, তাহলে পুলিশেই খবর দিতেন প্রথম।'

শুনে চোখ বুঁজে ফেললেন মিঃ বিলমোরিয়া, হাঁ-হয়ে গেল আবার মিসেস বিলমোরিয়ার মুখ। সেই সঙ্গে কিছুটা বুঝি মেজকা-রও।

গোগো বলল—'কী হোল, মিঃ বিলমোরিয়া? যান, গিয়ে হীরেটি নিয়ে আসুন রুসিসাহেবের ঘর থেকে। কোথায় লুকনো রয়েছে আমি বলে দিচ্ছি—'

শোনামাত্র ফট ক'রে চোখ খুলে গেল আবার মিঃ বিলমোরিয়ার। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে উত্তেজিত কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন—'কোথায়? কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?'

'ওর তামাক খাওয়ার ওই পাইপের মধ্যে। ওই কারণেই আপনি চুরির পর তার ঘরে গিয়ে তার পাইপ পরিষ্কার করে তাতে তামাক ভরতে দেখে-ছিলেন। অত তাড়াতাড়ি হীরেটি লুকিয়ে রাখার মতন অত ভালো জায়গা আর কী হতে পারে, আপনিই বলুন না!'

মিঃ বিলমোরিয়া ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে দুর দুর করতে শুরু করল গোগোর বুক। চোখ বুজে একমনে প্রার্থনা করতে শুরু করল গোগো—হে ভগবান, হিসেবটা যেন শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় আমার। আসলে না-হলেও তুমি ঠিক ক'রে দিও—এতটাই যখন এ-পর্যন্ত কোরেছো!'

যেমন গিয়েছিলেন, তেমনি ছুটতে ছুটতে ফিরে এলেন মিঃ বিলমোরিয়া। তার একহাতে প্যাঁচ-খোলা একটা পাইপের দুটো অংশ, অন্য হাতের দু-আঙুলে ধরা মটরদানার মতন একটা হীরে। গোগোর মুখের দিকে তাকিয়ে বারবার কী যেন বলার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি, শেষ পর্যন্ত পারলেন না। এগিয়ে এসে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন গোগোকে!

তারপর মিঃ বিলমোরিয়া ছাড়েন তো মিসেস বিলমোরিয়া! তিনি ছাড়েন তো বাড়িতে অমন গম্ভীরমুখে ঘুরে বেড়ানো মেজকা!

আর তারপরই বেয়ারা এসে জানালো মিঃ চিমনলাল দেখা করতে এসেছেন। গোগোকে মুক্তি দিয়ে মেজকা হাতের ঘড়ি দেখলেন, বললেন—'দশটা বাজে। অর্থাৎ যার হীরে, সেই ভদ্রলোক! মিঃ বিল-মোরিয়া, হীরেটি চোরাই ব'লে যদি এতটুকু সন্দেহ থাকে আপনার, তাহলে পুলিশে জানানো যে আপনার কর্তব্য সেটা আপনার উকিল হিসেবে আপনাকে আমি জানিয়ে দিলাম।'

* * *

এবারের গরমের ছুটিতে মেজকা সপরিবার কাশ্মীর যাচ্ছেন। গোগোও যে তাঁর সঙ্গে যাচ্ছে সেটা মেজকা জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর দাদা-বউদিকে। আর ছোটকা দারজিলিং থেকে ফেরার আগেই রওনা হবেন মেজকা। ফিরে সব খবর শুনে কি আর ছোটকার মেজাজ থাকবে তেনজিং নোরকে-র গল্প করবার?

ছবি এঁকেছেন ॥ মদন সরকার

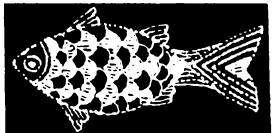

জানা না-জানা

পাহাড়ও হেঁটে বেড়ায়

বড় হতে কে না চায়। বাড়ন্ত পাহাড়ের খবর এশিয়াতেই আছে। রাধানাথ শিকদার যখন এভারেস্টের উচ্চতা নিরূপণ করেন, তখন এভারেস্ট ছিল ২৯,০০২ ফিট উঁচু। শতাধিক বছর বাদে এভারেস্টের উচ্চতা দাঁড়িয়েছে ২৯,০২৮ ফিট

পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমি পামির অত ধীরে ধীরে বাড়তে রাজী নয়। ১৯৭৩ সালে তার উচ্চতা ছিল ২৫,৪০৫ ফিট।

পামির বছরে পঞ্চাশ থেকে একশো ফিট বেড়ে চলেছে।

বাড়ন্ত পাহাড়ের মত চলন্ত পাহাড়ের খবরও এ যুগে দিয়েছে সোভিয়েত রাশিয়ার ককেশাস পর্বত-মালা। পুরাণের গল্পে জানা যায় এক সময়ে সব পাহাড়ই বেড়িয়ে বেড়াত। এ যুগেও তেমন কান্ড ঘটেছে। ১৯৭১ সালে ককেশাস পর্বত-অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টি পড়ে। ফলে ভূতলে জল-চাপ বেড়ে গিয়ে পাতাল-স্রোত বইতে শুরু করে। তার টানে একটি পাহাড় পথের খেত-খামার, ঘর-বাড়ি, সব ঠেলতে ঠেলতে চলতে থাকে। চলার পথে মাচোখ্‌ নদীর জল আটকে পাহাড়টি একটি হ্রদই তৈরি করে ফেলে। আটদিনে দুই কিলোমিটার পথ চলে তবে পাহাড়টির চলা বন্ধ হয়।

EVERY FORTNIGHT
NEW EXCITEMENT STRIKES!

PHANTOM MANDRAKE FLASH GORDON

WAR HEROES: FREEDOM FIGHTERS: MYTHOLOGICAL SAGAS...

...And a host of other super characters...stories! follow their adventures in Indrajal Comics!

Come, enter the exciting, fun filled world of Indrajal Comics, with characters and stories to keep you spell-bound for hours. These lavishly illustrated, full-colour comics come to you for just Re. 1/- a copy and are available in English, Hindi and Bengali.

Remember, it's a new adventure experience every fortnight—so don't miss out on the fun.

Indrajal Comics

A Times of India Publication

FOCUS B C.39

রাজায় রাজায়/কি করে দাবা খেলতে হয়

দাবার বোরডে ঘুঁটিগুলি সাজিয়ে নেওয়ার পর এবার জানতে হবে কোন ঘুঁটি কি ভাবে চলে। সাদা ঘুঁটির খেলোয়াড় সাদা ঘুঁটিগুলিকে চালে, আর কালো ঘুঁটির খেলোয়াড় চালে কালো ঘুঁটিগুলিকে। সাদা ঘুঁটি যার সে চাল শুরু করে। একবারের চালে সে কেবল একটি ঘুঁটিকে চালতে পারে। তারপর কালোকে চাল দিতে হবে, তারপর আবার সাদা এই ভাবে খেলা চলতে থাকে। শুরুতে যেটা খুসি সেটা চালা যায় না, কারণ চালতে গেলে জায়গা পাওয়া দরকার। খেলার শুরুতে চালা যায় আটটি বোড়ের যে কোন একটিকে, অথবা দুটি ঘোড়ার যে কোন একটিকে। অর্থাৎ, কোন বোড়ে বা ঘুঁটি না সরিয়ে একমাত্র ঘোড়াই অন্য ঘুঁটির উপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে পারে। অবশ্য ঘোড়া যে ঘরে গিয়ে বসবে সেটি ফাঁকা থাকা চাই, সেটাতে নিজের কোন ঘুঁটি থাকলে চলবেনা। যদি সেখানে প্রতিপক্ষের ঘুঁটি থাকে তবে অবশ্য সেটিকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে ঘোড়া বসতে পারে। এভাবে সরিয়ে দেওয়াকে বলে মেরে দেওয়া।

ঘোড়া যে ঘরে থাকে সে ঘরের নিচে বা উপর দিকে বা পাশাপাশি যে কোন দিকে দু ঘর যেয়ে সেই ঘরের পাশের দুটি ঘরের যে কোন একটিতে যেতে পারে। ইংরিজি টি অক্ষরের মত এর গতি। বলা হয় ঘোড়ার হচ্ছে আড়াই চাল, অর্থাৎ সামনে দু ঘর গিয়ে তারপর পাশের ঘর। ঘোড়া যদি কালো ঘরে থাকে, তাহলে ঘোড়া সাদা ঘরে যাবে, আর সাদা ঘরে থাকলে যাবে কালো ঘরে। একমাত্র ঘোড়াই এইরকম অদ্ভুত ভাবে চলতে পারে।

আর বোড়ে কি ভাবে চলে?

বোড়েগুলি সব চলে সামনের দিকে। এর বিশেষত্ব হল, বোড়েরা পিছিয়ে আসেনা বা পাশাপাশি বা কোনাকুণি ভাবে চলতে পারে না।

প্রত্যেকটি বোড়ের প্রথম চালে সামনের দিকে এক কিংবা দু ঘর চালা যায়। কিন্তু বোড়ের চাল একবার হয়ে গেলে সেই বোড়ে তারপর থেকে কেবল এক ঘরই যেতে পারে।

অবশ্য বোড়ে সম্বন্ধে আরো সব মজার ব্যাপার আছে। যেমন বোড়েগুলি এগুতে এগুতে যদি শেষ ঘরে কোন মতে পৌঁছে যেতে পারে তাহলে সেটা আর বোড়ে থাকে না।

আবু বলল, সেটা তখন কি হয়?

পিকু বলল, সেটা তখন বোড়ে ছাড়া আর যা খুসি তাই হতে পারে। একটা ঘোড়া হতে পারে, একটা গজ হতে পারে, নৌকো হতে পারে—কিংবা ইচ্ছে করলে মন্ত্রীও।

দিগ্‌দর্শক

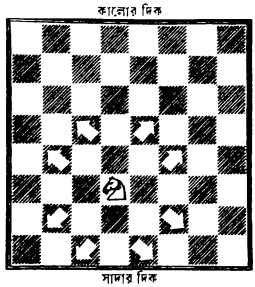

পূর্ব রেলওয়ে

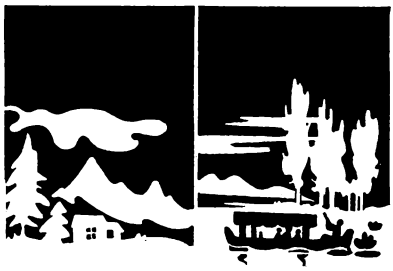

হিল কনসেশন রিটার্ন টিকিট এবং শ্রীনগরের জন্য রেল-বাস রিটার্ন টিকিট

দেশের বিভিন্ন শৈলনগরীতে ভ্রমণের জন্য কেবলমাত্র রেল-পথের অংশটুকুর জন্য দেড়াভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা-জনক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট বিক্রি গত পয়লা এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে। টিকিটের মেয়াদ তিনমাস পর্যন্ত বহাল থাকবে। যে কোন যাত্রাশুরুর ষ্টেশন থেকে শৈলনগরীর দূরত্ব কমপক্ষে ৮০০ কিলোমিটার হতে হবে। এই ধরনের টিকিট ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

শ্রীনগরের জন্য এই সুবিধাজনক ভাড়ার যাতায়াতের টিকিট হাওড়া, শিয়ালদহ এবং কলিকাতা ও হাওড়ার সিটি বুকিং অফিসগুলি হ'তে পাওয়া যাবে। তাছাড়া পূর্ব রেলওয়ের পাটনা, ধানবাদ, গয়া, ডাগলপুর ও আসানসোল ষ্টেশন থেকেও পাওয়া যাবে। রেলভাড়া ছাড়াও জম্মু তায়াই ও শ্রীনগরের মধ্যবর্তী অংশটুকুর জন্য ৪০ টাকা হারে যাতায়াতের বাসভাড়া একই সঙ্গে নেওয়া হবে, তবে ভ্রমণের সময়ে চালু বাসভাড়া অনুযায়ী এই হারের পরি-বর্তন ঘটতে পারে। তিন-বছরের উপর এবং বারো বছরের কম বয়স্ক শিশুদের জন্যও একই হারে বাসভাড়া লাগবে। তবে কোনক্রমেই ১৯৭৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্য-রাত্রির পরে শৈলনগরী অভিমুখে যাত্রা করা যাবে না।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে হবে কলিকাতা ফেয়ারলি প্লেসে পূর্ব রেলওয়ের ইনফরমেশন ব্যুরোর সুপারভাইজারের সঙ্গে, অথবা বিভিন্ন ষ্টেশনে।

চীফ কমার্শিয়াল সুপারিনটেনডেনট
পূর্ব রেলওয়ে
কলিকাতা

ER 280/75 R2BEN

কালো বেড়ালের গুপ্তধন

শৈলেন ঘোষ

গত সংখ্যার পর

সামনেটা ভালো করে ঠাওরই করতে পারছি না। দু-একটা ঠোক্করও খেলুম। তারপর অন্ধকার কাটিয়ে একটা ঘরে এলুম। আমার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগলো। লোকটা আমায় একটা ভাঙা চৌকি দেখিয়ে বললে, "ওইখানে বসো। আমি ডেকে দিচ্ছি।" বলে লোকটা ভেতরে ঢুকে গেলো।

ভাঙা বলে ভাঙা। চৌকির ওপর বসতেই ল্যাকপ্যাকে পয়া চারটে কাঁচ কাঁচ করে ভেংচিয়ে উঠলো। আমি ভাবলুম পড়ব নাকি! অবশ্য পড়িনি। ভাঙা চৌকির ওপর একা বসে ঘরটার চেহারা জুলজুল করে দেখতে লাগলুম। কোন্ জন্মের বাড়ি কে জানে! দেখে মনে হচ্ছে, এক্ষুনি বুঝি কড়ি-কাঠগুলো হুড়মুড়িয়ে ঘাড়ের ওপর পড়ে! ঝাড়-পোঁচও করে না। এমন একটা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ! মনে হচ্ছে নাকে কাপড় দিই। না, সেটা ঠিক না। নাক আমার খোলাই থাক। গন্ধটা নিশ্চিন্তে নাকে সেঁদুক। ভদ্দরলোকের বাড়িতে নাকে কাপড় জড়িয়ে বসে থাকাটা অসভ্যতা!

নাকে কাপড় গুঁজলুম না বটে, কিন্তু হঠাৎ আমার চোখ দুটো ভয়ে ঠাউরিয়ে উঠলো। আমার প্রায় সামনে মুখোমুখি দু-দুটো খাঁড়া ঝুলছে। ঘরে যদিও তেমন আলো আসছিল না, কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে খাঁড়া দুটো ঝকঝক করছে। আমি ভাবলুম, গেছি! এ আবার কার খপ্পরে পড়লুম!

"ঝনঝন ঝনাৎ!" নিস্তব্ধ ঘরটা কেঁপে উঠলো। আমি থতমত খেয়ে গেছি! ভালো করে কিছু বোঝার আগেই চেয়ে দেখি সেই খাঁড়াদুটো ঘরের মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে! আমি আগু-পিছু কিছু না ভেবে মারলুম ছুট!

ছুটতে পারলুম না। আমার হাতটা যেন কে ধরে ফেললে! চেয়ে দেখি আমার সামনে সেই ভদ্দরলোক!

আমি কিছু বলার আগেই ভদ্দরলোক আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে, মানুষ অর্ধেক রেগে গেলে চোখের ভেতর যেমন আধা-আধি রাগ দেখা যায়, তেমনিভাবে আমার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো! আমি কি করবো ভেবে দেখতে দেখতেই লোকটা বললে, "ডাকাতি করতে পারবি?"

আমি আকাশ থেকে পড়লুম!

আমার উত্তর না-পেয়ে লোকটা ধমক দিয়েই বললে, "কিরে পারবি?"

আমি বললুম, "আজ্ঞে পেয়ারা!" ভয়ে গলা আমার কাঠ হয়ে গেছে!

"আমি যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর দে," লোকটা তেমনি গম্ভীর গলায় বললে।

আমি বললুম, "বেলা পড়ছে। আমি বাড়ি যাবো। পেয়ারার মালিককে ডেকে দিন!"

"তুই আর বাড়ি যেতে পারবি না। এখানেই তোকে থাকতে হবে। হয় তোকে ডাকাত হতে হবে, না হয় মরতে হবে। এখানে তোকে কেটে ফেললেও কেউ জানতে পারবে না।" বলে লোকটা একটা খাঁড়া নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো।

আমি বুঝতে পারলুম, আমার কম্ম শেষ! আর বুঝলুম, ইনি মোটেই ভদ্দরলোক নন। ইনি ডাকাতের পান্ডা! আমি চোখে সরষের ফুল দেখতে শুরু করলুম। আমার শরীরটা কি রকম অবশ হয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল, পা দুটো আমার সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। এক্ষুনি মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যাবো, কিংবা দম আটকে মরে যাবো।

লোকটা এবার খাঁড়াটা আমার মাথার ওপর তুলে ধরলে। আমার মুখের রা মুখেই আটকে গেছে! ভদ্দরলোকের গলাটা বাঘ রেগে গেলে যেমন গর-র-র, গর-র-র করে, তেমনি করতে লাগলো। আমি ভাবলুম এবার আমার মুণ্ডুপাত হবে। আমি মরবো। মরা ভালো, না, ডাকাত হওয়া ভালো, এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ কে যেন আমার মুখ দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো, "না, আমি ডাকাত হবো না—!"

লোকটার খাঁড়া আমার ঘাড়ের ওপর খাঁচাং করে নেমে এলো। আমি মাথা

সামলাতে গিয়ে টাল সামলাতে পারিনি। হুড়মুড় করে পেয়ারার ঝুড়ির ওপর ঘসটে পড়লুম। কাশির পেয়ারাগুলো মাটির ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগলো।

আমি ধাক্কা সামলাতে সামলাতে বুঝে নিয়েছি, খাঁড়া আমার ঘাড়ে পড়েনি। ফসকে গেছে। কিন্তু একবার ফসকে গেছে বলে তো আর বার বার ফসকে যাবে না। এবার আর নিস্তার নেই। আমি তখন কি রকম মরিয়া হয়ে উঠলুম। মনে হলো, মরতে যখন হবে তখন কাপুরুষের মত মরি কেন! ওই পেয়ারাগুলো ছড়া তখন আমার হাতের কাছে আর কিছু ছিল না। আমি দুটো, তিনটে, চারটে যতগুলো পেরেছি পেয়ারা তুলে নিয়ে, একটা টেনে মেরেছি লোকটার মুখে। মেরে যেই আর একটা ছুঁড়তে গেছি, আমার হাতের পেয়ারা হাতেই রয়ে গেল! আমি দেখলুম, লোকটার হাতের খাঁড়া সাত হাত দূরে ছিটকে পড়েছে! অত বড় লোকটা নিমেষের মধ্যে উবে গিয়ে একটা সাদা রঙের ইঁদুর হয়ে গেছে! আমি কিছু ভেবে ওঠার আগেই দেখি, সাদা রঙের ইঁদুরটা ভীষণ তেড়ে আমায় কামড়ে দিতে আসছে। আমি ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিলুম। আমার হাতে তখনও দুটো পেয়ারা। কি করবো, কিছুই ভাববার মত অবস্থা ছিল না। আমি ঘুরপাক খাচ্ছি আর ইঁদুরের ভয়ে পালাবার রাস্তা খুঁজছি।

আমি পালালুম। মানে ছুটলুম। ইঁদুরটাও ছুটলো। আমার পিছু নিলো। আমার তখন দিক-বিদিক জ্ঞান ছিল না। যেদিকে পেরেছি ছুটেছি। এ-ঘর পেরিয়ে, ও-ঘর ডিঙিয়ে মার ছুট! আমি জানবো কি করে, যতই ছুটেছি ততই আমি ওই ভাঙা বাড়িটার একেবারে অন্দরে গিয়ে পড়ছি। কে জানে সেখানে কি বিপদ আছে!

আমি বুঝতে পারছি আমার দম ফুরিয়ে এসেছে। আমি আর ছুটতে পারছি না। এখন ধরে নিয়েছি ইঁদুরটা আমায় কামড়াবেই। প্রাণের ভয়ে সামনের ঘরটায় ঢুকে পড়লুম। পাঁড়-মরি ঘরের দরজাটা দু হাত দিয়ে যেই বন্ধ করতে গেছি, আমার হাত থেকে একটা পেয়ারা ফসকে পড়ে গেল। ঘরের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে টাল রাখতে পারলুম না। "ফ্যাঁচ-চ-চ!" একটা বিচ্ছিরি আওয়াজ আমার পেছনে! ফিরেই দেখি একটা কালো রঙের বেড়াল লাফিয়ে পড়েছে? লাফিয়েছে একেবারে সাদা রঙের ইঁদুরটার সামনে।

চোখের পলক পড়তে পড়তেই দেখি, বেড়ালটা ইঁদুরটাকে টপাস করে গিলে ফেললে! উঃ! বেঁচে গেছি!

না, বাঁচিনি! বেড়ালটা এবার আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। আমি আগে অনেক বেড়াল দেখেছি; কিন্তু এমন বিদ্‌ঘুটে কালো রঙের বেড়াল কখনও দেখিনি। চোখ দুটো যেমন কটা, পায়ের নোখগুলো তেমনি খোঁচা খোঁচা। পা-পা এগিয়ে আসছিল আমার দিকে। আমি ভয় পেলুম, এবার বোধ হয় আমাকে কামড়াবে, কিম্বা পায়ের নোখ দিয়ে খামচে দেবে। আমি লাফিয়ে উঠে সরে গেলুম।

বেড়ালটা কাঁপা এসেই ওঁৎ পেতে আমার সামনে বসে পড়লো। ল্যাজ নাড়তে লাগলো। বেড়ালের সেই ল্যাজ নাড়া দেখে, আমার আর নড়ানড়ি করতে সাহস হলো না। কি জানি, পেটে পেটে কি মতলব ভাঁজছে বাছাধন।

তাহলে এখন আমি কি করি। আচ্ছা, বেড়ালটার সঙ্গে ভাব করা যায় না? যতই হোক বেড়াল তো আর বাঘ-ভালুক নয় যে, ভাব করতে গেলে কামড়ে দেবে! তাছাড়া যখন ষণ্ডা-মার্কা ডাকাতের সর্দারের হাত থেকে বেঁচে উঠেছি, তখন একটা তুচ্ছ বেড়াল আমার কি করবে! আমি ভাব করবার জন্যে বেড়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে মুখে আওয়াজ দিলুম, "তু-তু-তু-তু!"

এই সেরেছে! বেড়ালটা যে হঠাৎ একেবারে একটা মেয়েমানুষের মত কেঁদে উঠলো! কাঁদতে কাঁদতে বললে, "তু-তু করছিস কেন রে ছেলেটা? আমি কি কুকুর?"

এর আগে সাদা ইঁদুরগুলোকে কথা বলতে শুনে যতটা অবাক হয়েছিলুম, এবার বেড়ালকে কাঁদতে দেখে চোখ আমার ঠিক ততটা কপালে উঠলো না, কিন্তু কপাল আমার ভীষণ টনটন করে উঠলো। আমি মুখে কথা বলতে পারছিলুম না। মনে মনে বলছিলুম, "আদরের মেনি আমার, আমি তোমায় কুকুর বলিনি, আদর করে ডাকছিলুম। এখন একটু পথ ছেড়ে দাও তো বাছা। আমি ঘরের ছেলে ঘরে যাই!"

বেড়ালটা এবার নাকিসুরে নেকিয়ে নেকিয়ে বললে, "আমি যে কাঁদছি, আমার চোখ দিয়ে যে জল পড়ছে, দেখতে পাচ্ছিস না? আমায় একটু ভোলাতে পারিস না? তোর হৃদয়ে একটু দয়ামায়া নেই।"

আমি আমার বুকে হাত বুলালুম। দেখলুম, আমার হৃদয় ঠিকই আছে। আমার হৃদয়ের ধড়-ফড়ানিটা বেড়ালের কান্না দেখে অনেকটা ঠান্ডা হয়ে এসেছে! যা থাকে কপালে কপালে! আমি তড়াং করে লাফিয়ে বেড়ালের সামনে বসে পড়লুম। কালো বেড়ালটাকে কোলের ওপর তুলে নিয়ে আদর করতে করতে বললুম, "না, না, কেঁদো না। কি হয়েছে সোনামণি? আমি তোমায় ল্যাবাঞ্চুস দেব, গলায় ঝুমঝুমি পরিয়ে দেব। না, না, থাক থাক!"

বেড়ালটা আমার আদরে গদগদ হয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বললে, "শুধু আদর করলে চলবে না, আমাকে তোর সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।"

এই খেয়েছে, আমি জানি কুকুরকে লাই দিলে মাথায় ওঠে! বেড়ালও যে ওঠে আমার জানা ছিল না। দেখো দিকিনি কি শুকনো আবদার! আমার বুড়ো বাপ-মা-ই দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না, তা বেড়াল নিয়ে কি আমি ফ্যাসাদে পড়বো!

বেড়ালটা আবার আদুরি আদুরি গলায় আমার কোলে দুলতে দুলতে বললে, "বলনা, আমায় তোর সঙ্গে নিয়ে যাবি?"

আমি কথাটা চাপা দেবার জন্যে বেড়ালের মুখের কাছে মুখ এনে, একটু "ইলি ইলি" করে জিব নেড়ে জিজ্ঞেস করলুম, "মেনি, মেনি, মৌনি, সর-ভাজা খাবি?"

"উঁ! কথা ঘোরাচ্ছে।"

এই দেখো, বেড়ালটা আমায় মতলব ধরে ফেলেছে! কি চালাক!

বেড়াল বললে, আমায় না নিয়ে গেলে আমিও তোকে এখান থেকে যেতে দেব না। আর যদি নিয়ে যাস, তবে তোকে একটা—বলতে বলতে থামলো বেড়ালটা।

আমি বললুম, "থামলে কেন আদরের মেনি? বল না, বল, তোমার মনের কথাটা খুলে বলো।"

বেড়াল বললে, "তুই আগে বল, তারপর আমি বলবো।"

আমি বললুম, "তুমি আগে বল, তারপর আমি বলবো।"

"তুই আগে।"

"তুমি আগে।"

আমি বললুম, "তুমি আগে বল। তারপর আমি বলবো।"

তারপর অনেকক্ষণ "তুই আগে, তুমি আগে" করতে করতে বেড়ালটা হি-হি-হি করে হেসে উঠে বললে,

"দুষ্টু আয় আমার সঙ্গে।"

বেড়াল আমার কোলের থেকে নেমে, অন্ধকারে পথ দেখিয়ে কে জানে কোথায় নিয়ে চললো।

ভীষণ অন্ধকার। অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে বেড়াল আমায় একটা ঘরের সামনে নিয়ে এসে দরজা ঠেলে বললে, "আয়।"

ঘরে ঢুকে চক্ষু আমার স্থির! আলো, শুধু আলো। চারিদিকে আলো আর তাল তাল সোনা। বস্তা বস্তা হীরে-চুনি-পান্না। গড়াগড়ি যাচ্ছে, ছড়াছড়ি যাচ্ছে!

বেড়াল জিজ্ঞেস করলে, কি দেখছিস?"

আমি বললুম, "তোমাকে।"

বেড়াল বললে, "দূর বোকা, সোনা দেখছিস, না রূপো দেখছিস?"

আমি বললুম, "আমি সোনা দেখছি, রূপো দেখছি, তোমায় দেখছি।"

বেড়াল বললে, "এ আমার গুপ্ত-ধন। আমায় যদি তোর সঙ্গে নিয়ে যাস, তাহলে তোকে আমি দেব।"

আমি একেবারে চিলের মত চেঁচিয়ে উঠলুম, "নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো।"

আমার চেঁচানি শুনে, বেড়ালটা তেমনি তেড়ে ধমকে উঠলো, "আদেখলেদের মত চেঁচাছিস কেন?"

আমি ধমক খেয়ে সিঁটিয়ে গেলুম। আমতা আমতা করে বললুম, "আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে তো! তাই!

বেড়াল বললে, "কি নিবি?"

আমি হাঁক-পাঁক করতে লাগলুম। বললুম, "সবতো নিতে পারবো না, সোনা নেবো।"

বেড়াল জিজ্ঞেস করলে, "ক বস্তা?"

আমি বললুম, "য বস্তা পারি।"

বেড়াল বললে, "ঠিক আছে, আজ দু'বস্তা নিয়ে চল। কাল আবার নিয়ে যাবি।"

আমি বললুম, "রোজ নিয়ে যাব?"

বেড়াল বললে, "হ্যাঁরে, যদ্দিন না ফুরোয়।"

আমি ঘরের চারপাশটা দেখতে দেখতে ভাবলুম, "এ আর কোনদিনই ফুরুবে না।"

আমার কোমরের কাপড়টা বেশ করে কষে বেঁধে নিলুম। ট্যাঁকে আমার বাদাম বেচার বউনির টাকাটা। বেশ কসরৎ করেই দু'বস্তা সোনা পিঠে তুলে নিলুম। বেড়ালকে বললুম, "মেনি আমার কোলে এসো।"

মেনি কোলে লাফিয়ে উঠলো। সোনার বস্তা পিঠে নিয়ে আর মেনিকে কোলে নিয়ে অন্ধকারে হাঁটা শুরু করলুম।

হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় এসে দেখি রাত হয়েছে। বেড়ালকে জিজ্ঞেস করলুম, "এবার কোন দিকে যাবো মেনি?"

মেনি বললে, "ওই দিকে।"

ঘরে পৌঁছুতে পৌঁছুতে আরও রাত হয়ে গেলো। যা ভেবেছিলুম হয়েছেও তাই। আমার বুড়ো-বাপ আর বুড়ি-মা ছেলের আশা ছেড়ে দিয়ে কান্না-কাটি সুরু করে দিয়েছে। আমায় দেখতে পেয়ে, কান্নার জল মুছতে মুছতে মা জিজ্ঞেস করলে, "তোর কোলে এটি কে?"

আমি বললুম, "মেনি।"

বাবা জিজ্ঞেস করলে, "তোর পিঠে ওটা কি?"

আমি বললুম, "সোনা।"

আমি বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম। আর কিছু বলতে পারলুম না। ট্যাঁকের পনেরটা টাকা বাবার হাতে গুঁজে দিয়ে বললুম, "বাদাম বেচার টাকা।" বাবা বাদাম বেচার টাকাটা মায়ের আঁচলে বেঁধে দিয়ে, বস্তা খুলে সোনা ওজন করতে বসলো।

আমার খিদে যা পেয়েছিল, কি বলবো! খুব করে খেলুম. মেনিকে খাওয়ালুম। তারপর দুটিতে শুতে গেলুম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না।

মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখলুম, আমার পাশে মেনি ঘুমুচ্ছে। কানে এলো, বাবা তখনও সোনা ওজন করছে। আর আমার মা বাবার মাথায় হাওয়া করছে।

আমি বেড়ালকে জড়িয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লুম।

ছবি এঁকেছেন ॥ প্রণবেশ মাইতি

বিমল কর

কাপালিকরা এখনও আছে

উপন্যাস

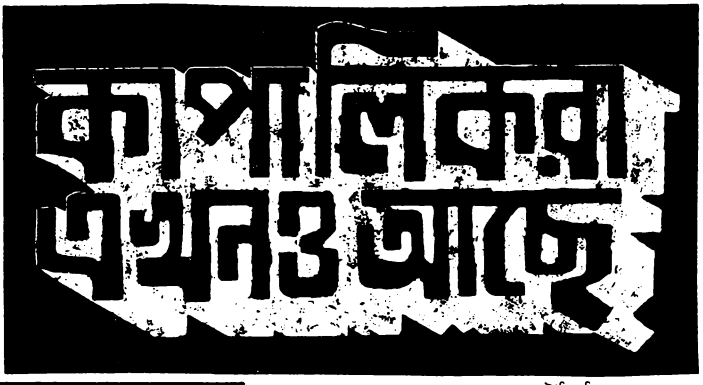

আগে যা ঘটেছে

বউবাজারের এক গলির গলি গঙ্গাচরণ মিত্তির লেনে থাকত তারাপদ। তিন কুলে আর কেউ ছিল না। চাকরি বাকরি জোটে নি বেচারীর, টিউসানি করে কোনো রকমে বটুকবাবুর মেসের খরচ চালাত। প্রতি মাসেই ধার দেনা বাড়ত। একদিন একেবারে আচমকা তারাপদ একটা চিঠি পেল সলিসিটার মৃণাল দত্ত-র কাছ থেকে। মৃণাল দত্ত, তারাপদকে পত্রপাঠ দেখা করতে বলেছেন। চিঠি পড়ে মনে হল, ভুজঙ্গভূষণ হাজরা নামের এক ভদ্রলোকের দেড় দু লাখ টাকার সম্পত্তি তারাপদর ভাগ্যে নাচছে। কিন্তু কে এই ভুজঙ্গভূষণ? তারাপদ চেনে না। পদবী থেকে অনুমান হয়, তিনি তারাপদর এক পিসেমশাই হতেও পারেন। তারাপদ তার ডাক্তার বন্ধু চন্দনকে নিয়ে পুরোনো আলিপুরে মৃণাল দত্তর বাড়িতে দেখা করতে গেল সেদিনই সন্ধ্যে বেলায়। প্রথম দিকের কথাবার্তার পর মৃণাল দত্ত চন্দনকে অন্য ঘরে পাঠিয়ে তারাপদকে পরীক্ষা করতে লাগলেন, পরখ করে দেখতে লাগলেন এই তারাপদ আসল না নকল?

মৃণাল দত্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন তারাপদকে। পরীক্ষার সময় তারাপদ অবাক হয়ে দেখল, তাদের পারিবারিক অনেক ছবি ভুজঙ্গভূষণ গোপনে সংগ্রহ করে নিজের কাছে রেখেছিলেন, এমন কি তারাপদর বড় বয়েসের ছবিও। তারাপদ জানতে পারল, তাদের এক সাধুমামার মারফত ভুজঙ্গভূষণ ওই সব ছবি যোগাড় করতেন, খবরাখবর রাখতেন। যাই হোক, পরীক্ষায় তারাপদ আসল বলেই প্রমাণিত হল। মৃণাল দত্ত তখন ভুজঙ্গভূষণের ঠিকানা দিলেন, মধুপুরের কাছে শংকরপুরে ভুজঙ্গভূষণ থাকেন। কিছুদিন আগে তাঁর এক দুর্ঘটনা ঘটেছে, তিনি মরণাপন্ন, আগামী সাত আট দিনের মধ্যেই ভদ্রলোক মারা যাবেন। ভুজঙ্গভূষণ জীবিত থাকতে থাকতে যদি তারাপদ শংকরপুরে তাঁর কাছে মৃণাল দত্তর চিঠি নিয়ে পৌঁছতে পারে—তবেই সে ভুজঙ্গভূষণের সম্পত্তি পেতে পারে, নচেৎ নয়।

তিন

টাইম টেবুল্-এ গাড়ি ছাড়ার সময় রাত প্রায় দশটা: ন'টার আগেই তারাপদরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেল। হাতে খানিকটা সময় থাকা ভাল, টিকিট কাটা, আগেভাগে বসবার জায়গা দখল করা। সারা রাত এই শীতে তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া যাবে না, ঘুমোতে না পারুক—অন্তত ভাল করে বসার জায়গা দরকার।

তারাপদ নিজে টিকিট কাটতে গেল না। চন্দনকে পাঠিয়ে দিল। সারাটা দিন আজ তারাপদর বড় ছুটোছুটি গিয়েছে। কাল সারা রাত তেমন একটা ঘুমোতেই পারল না, মাথার মধ্যে মৃণাল দত্ত আর ভুজঙ্গভূষণ। ওরই মধ্যে সাধুমামার মুখ মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছে, মা বাবার কথা মনে পড়েছে, পরীর কথাও মনে পড়ল। পরীর মুখ তো মনেই ছিল না তারাপদর, ছবি দেখে মনে পড়ল। ওই একটিমাত্র বোন, আর তো কেউ ছিল না তার, আহা সে বেচারীও থাকল না। হাজার চিন্তায় ঘুম হল না। তার ওপর ওই ব্যাপারটাও তাকে বেশ অবাক করে তুলেছিল। মৃণালবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়েই চন্দন সেই কালো বেড়ালটার কথা বলল। বেড়ালটা নাকি ঘড়ির কাঁটার মতন ঘুরে যায়। চন্দন স্বচক্ষে দেখেছে, তারাপদরা যখন মৃণালবাবুর ঘরে গিয়ে বসে তখন তার মুখ ছিল তাদের দিকে, আর যখন চলে আসে তখন বেড়ালটার মুখ মৃণাল দত্তর দিকে। এ কি করে সম্ভব? একটা ভুয়ো, নির্জীব, পুতুল ধরনের বেড়াল কেমন করে মুখ ঘোরাবে? চন্দন নিশ্চয় ভুল দেখেছে।

চন্দন জোর দিয়ে বলল, না, সে ভুল দেখেনি। ঠিকই দেখেছে।

কেমন করে এটা হয় তারাপদ বুঝতে পারল না। ভূতের ব্যাপার নাকি? ম্যাজিক?

ভুজঙ্গভূষণের পুরো ব্যাপারটাই ভূতুড়ে মনে হচ্ছে, ভাবতে গেলে সেরকমই মনে হয় নাকি? কোথায় তারাপদ আর কোথায় ভুজঙ্গভূষণ—চেনা না জানা না— কস্মিন-কালেও যারা পরস্পরের মুখ পর্যন্ত দেখল না, তারা কেমন করে আজ একজন অন্যজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে! ভুজঙ্গভূষণ খুঁজছে তারাপদকে, আর তারাপদ খুঁজে বেড়াচ্ছে ভুজঙ্গভূষণের দেড় দু লাখ টাকার সম্পত্তি! সত্যিই ব্যাপারটা ভূতুড়ে।

ব্যাপার ভূতুড়ে হোক আর যাই হোক, সকালে ঘুম থেকে উঠে তারাপদকে মৃণালবাবুর কাছে ছুটতেই হল। দেড় দু লাখ টাকার লোভে কি? হতে পারে। আবার টাকার লোভ ছাড়াও কেমন একটা রহস্যের টানও রয়েছে। সত্যি সত্যি ওই ভুজঙ্গভূষণ কে? কেনই বা তাঁর ওই রকম কাপালিক-মার্কা চেহারা? কি করতেন তিনি এতোকাল? কেন কোনোদিন তারাপদদের খোঁজ খবর নেননি, অথচ সাধুমামাকে দিয়ে তাদের পরিবারের—মানে তারাপদর মা বাবা, পরী সকলের ছবি যোগাড় করে নিয়েছেন? কি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল?

হাজার রকম কেন'র কোনো জবাব যেমন পাওয়া যাচ্ছে

না—সেই রকম বোঝা যাচ্ছে না ভুজঙ্গভূষণ কি করে জানতে পারলেন যে সামনের অমাবস্যা পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকবেন? ভদ্রলোকের কি ইচ্ছামৃত্যু? কে জানে বাবা? এতো রকম অবাক হবার ব্যাপার যখন রয়েছে তখন কালো বেড়ালটার মুখ ঘোরানোও আর এমন কি আশ্চর্যের! তবে, ওই কালো বেড়ালটা তো ছিল মৃণাল দত্তর ঘরে। তা হলে? মৃণাল দত্তও কি ভুজঙ্গভূষণের ছোঁয়াচ পেয়েছেন?

সকালে মৃণাল দত্তকে একবার কালো বেড়ালটার কথা জিজ্ঞেস করলে হত। এ-সব কথা জিজ্ঞেস করতে লজ্জাও তো করে। কিন্তু সে সুযোগই হল না। পুরোনো ঘরে মৃণাল দত্ত তারাপদকে আর বসাননি। বাইরের বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখে তাঁর দরকারী কাগজপত্র এনে দিলেন। যেন তিনি জানতেন তারাপদ ঠিকই আসবে, রাত পোহালেই এসে হাজির হবে। সমস্ত তৈরি করে রেখেছিলেন। সিলমোহর করা একটা চিঠি, সামান্য ভারী মতন একটা প্যাকেট, রেজিস্ট্রি করা পার্শেলের মতন চেহারা সেটার, চারপাশে গালা দিয়ে সিল করা, মোহরের ছাপ।

সেই সব জিনিস নিয়ে তারাপদ এল চন্দনের মেডিক্যাল হোস্টেলে। চন্দনকে বলল, চাঁদু তোকে সঙ্গে যেতে হবে।

চন্দন প্রথমটায় রাজী হচ্ছিল না; তার হাসপাতাল। আবার পুরো ব্যাপারটাই এমন গোলমেলে যে একলা তারাপদকে ছেড়ে দিতে তার ভাল লাগছিল না। তারাপদ কোনো কালেই সাহসী নয়, বরং ভীতু ধরনের: তার শরীর স্বাস্থ্যও ততটা মজবুত নয়; নিরীহ ভালোমানুষ গোছের ছেলে ও; ভিড়ের ভয়ে কোনোদিন মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের লীগ বা শিল্ডের খেলা পর্যন্ত দেখতে গেল না। চন্দন কতবার বলেছে, চল্ না—আমি তো রয়েছি। তারাপদ মাথা নেড়েছে আর বলেছে, থাক্ ভাই আমার মাঠে গিয়ে দরকার নেই, রিলে শুনলেই আমার খেলা দেখা হয়ে যাবে।

সেই তারাপদকে একলা একলা কি করে ছেড়ে দেয় চন্দন! তারাপদর মা যখন মারা যায় চন্দন শ্মশানে গিয়েছিল, তার মনে আছে সেদিন বারবার তারাপদ শুধু চন্দনকেই আঁকড়ে ধরছিল আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

অনেক রকম গবেষণার পর ঠিক হল, চন্দন হাসপাতাল থেকে কয়েক দিনের ছুটি নেবে, বলবে—বাবার অসুখ। কথাটা মিথ্যে হলেও করার কিছু নেই, ছুটির যখন দরকার তখন বড় কিছু একটা না বললে ছুটি দেবে কেন?

চন্দন রাজী হয়ে যাবার পর তারাপদ বটুকবাবুর মেসে ফিরল। স্নান খাওয়া সেরে আবার বেরুলো কিছু টাকা পয়সা জোগাড়ের ধান্ধায়। বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে যা পায় জুটিয়ে অন্তত একশো সোয়া শো টাকা তো হাতে রাখতেই হবে।

দুপুরের পর তারাপদ মেসে ফিরল। বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তারপর গোছগাছ শুরু করল।

সন্ধ্যের গোড়ায় গেল চন্দনের হোস্টেলে। চন্দন প্রায় তৈরি। তারপর দুই বন্ধু মিলে জয় মা বলে বেরিয়ে পড়েছে। দেখা যাক্ কপালে কি আছে!

চন্দন টিকিট কেটে ফিরে এসে বলল, "নে, চল্...। ন নম্বরে গাড়ি দেবে।"

জিনিসপত্র তেমন কিছু নেই তাদের, দু জনের দুটো কিট্ ব্যাগ, চন্দন একটা কম্বল নিয়েছে হাতে ঝুলিয়ে, রাত্রে শীতের হাত থেকে বাঁচতে হবে। তারাপদর কম্বল নেই, সে একটা তুষের পুরোনো চাদর আর বঙ্কিমদার হনুমান টুপিটা নিয়ে নিয়েছে সঙ্গে করে। মেসে কেউ জানে না—তারাপদ কোথায় যাচ্ছে। তারাপদ শুধু বলেছে, একটু বাইরে যাচ্ছি এক বন্ধুর সঙ্গে, দরকার আছে।

প্লাটফর্মে ঢুকে তারাপদরা দেখল, ভিড় ভীষণ একটা কিছু নয়, মোটামুটি। প্যাসেঞ্জার ট্রেন; তায় আবার শীতকাল, হয়ত তাই ভিড়টা কমই।

একটু পরেই প্লাটফর্মে গাড়ি দিয়ে দিল।

চন্দন বাহাদুর ছেলে। গাড়ি প্লাটফর্মে ঢুকতে না ঢুকতেই কি এক বিচিত্র কায়দায় সে চলন্ত ট্রেনের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে পড়ল।

গাড়ি দাঁড়াবার পর তারাপদ খুঁজে খুঁজে চন্দনকে বের করে নিল। চমৎকার জায়গা জুটিয়ে কম্বলটা বিছিয়ে ফেলেছে।

গাড়িতে উঠে তারাপদ বলল, "তোর দৌড়বার কি ছিল? ভিড় তেমন নেই।"

চন্দন বলল, "দেখতেই পাবি। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে আসুক। নে বসে পড়। এদিকে আয়—জায়গা নিয়ে বস্—চাদরটা বিছিয়ে দে; শোবার জায়গা ছাড়বি না।"

কিট ব্যাগ মাথার কাছে রেখে একেবারে কোণের দিকে মুখোমুখি দুই বন্ধু কম্বল আর চাদর পেতে ফেলল। কামরায় লোক উঠছে, কুলি উঠছে, আবার নেমেও যাচ্ছে, মালপত্র রাখার হইচই।

চন্দন নিজের জায়গায় বসে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। "তোর এই মালগাড়ি কাল ন'টা দশটার সময় শংকরপুরে পৌঁছবে।"

গাড়িটা অবশ্য প্যাসেঞ্জার ট্রেন, মালগাড়িরই যমজভাই। ঢিকির ঢিকির করে যাবে, হাজারবার দাঁড়াবে। অন্য কোনো গাড়িতে যাওয়া চলত, কিন্তু সারাদিন এত ছুটোছুটি করতে হয়েছে তারাপদকে যে সে-সুযোগ তার হয় নি। একটা এক্সপ্রেস গাড়ি ছিল, সেটা শংকরপুরে দাঁড়াত না।

ততক্ষণে দু' বন্ধু মিলে সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছে। কামরায় লোক বাড়ছে, দেখতে দেখতে বেশ ভিড় হয়ে গেল। প্লাটফর্মে আরও যাত্রী এসে পৌঁছচ্ছে। তারাপদদের কামরায় এক দঙ্গল বেহারী উঠেছে, দু' পাঁচজন বাঙালীও।

এমন সময় এক অদ্ভুত ধরনের ভদ্রলোক এসে কামরায় উঠলেন। টিয়াপাখির মতন নাক, তোবড়ানো গাল, গর্তে বসা চোখ। চেহারাটি রোগাসোগা, গায়ে সেই আদ্যিকালের অলেস্টার, মাথায় কাশ্মীরি টুপি, ডান হাতে একটা সুটকেস ঝুলছে, বাঁ হাতে খয়েরী বালাপোষ। ভদ্রলোক এতই রোগা যে গায়ে অলেস্টার চাপিয়েও তাঁকে মোটা দেখাচ্ছে না। গলায় মোটা মাফলার জড়ানো।

চন্দন ভদ্রলোককে দেখে নীচু গলায় বলল, "ডিসপেপ্সিয়ার কেস রে তারা, টিপিক্যাল ডিসপেপটিক পেশেণ্ট্।"

ভদ্রলোক তারাপদদের দিকেই এগিয়ে এলেন। কাছে এসে এমন মুখ করে হাসলেন যেন কতই না চেনা তারাপদর, গঙ্গাচরণ মিত্তির লেনে রোজই দেখা হয়।

"কত দূরে?" ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন হাসিমুখে। হাঁসবার সময় তাঁর দাঁত দেখা গেল। এবড়ো খেবড়ো কালচে দাঁত, পান-খাওয়া দাঁত যেন।

তারাপদ ভদ্রলোককে কোনোদিন দেখে নি। জবাবও দিল না কথার।

ভদ্রলোক কিন্তু নির্বিকার, সুটকেসটা বেঞ্চির তলায় রেখে বালাপোষটা বিছিয়ে নিলেন, তারাপদর চাদর সামান্য গুটিয়ে গেল। তাঁর চেনাচেনা হাসি আর কথা : "এই ট্রেনটায় যত ছিঁচকে চোরের উপদ্রব, বুঝলেন মশাই: চোখের পাতা দু দন্ড বুজেছেন কি পুঁটলি-পাটলা সুটকেস ব্যাগ হাওয়া। ওই দরজার দিকটায় তাই গেলাম না। ...ওদিকটায় একটু পরেই দেখবেন কি হয়—ছিলিম চলবে! সে কি দুর্গন্ধ। গোয়ালাগুলো বোম ভোলার জাত। গাঁজাই ওদের সর্বনাশ করল। ...দেখি স্যার, আপনার পা-টা একটু সরান—সুটকেসটাকে স্লেস করে দি আরও একটু সেফ্ সাইডে।"

চন্দন হেসে ফেলেছিল। সামলে নিল।

ভদ্রলোক এবার গোছগাছ সেরে তারাপদর পাশে বসলেন।

গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে আসছিল। প্লাটফরমের কলরব কমে আসছে যেন। তারাপদদের কামরা থেকে কিছু বেহারী লোকজন নেমে গেল।

ভদ্রলোক ততক্ষণে পান-জরদা মুখে পুরেছেন।

"আপনারা কন্দুর যাবেন স্যার?" ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন।

তারাপদ কিছু বলার আগেই চন্দন বলল, "মধুপুর-টধুপুরের দিকে।"

"মধুপুর? কোথায়? কোন দিকটায়?"

"আপনি মধুপুর থাকেন?"

"না স্যার, আমি ওরিজিনালি ভাগলপুরের, তারপর থেকোছ জামসেদপুরে, শেষে ইছাপুরেও কিছুদিন ছিলাম, এখন আর কোনো পুরে থাকি না, টুরে টুরে দিন কেটে যায়।"

তারাপদ হেসে ফেলল। চন্দনও।

"আমার স্যার কতকগুলো বদ্ দোষ আছে," পান চিবোতে চিবোতে ভদ্রলোক বললেন, "আমি হাসিঠাট্টা করতে ভালবাসি। আমার আপন-পর নেই। ভেরী ফ্র্যাংক...। একটা কথা স্যার আগেই বলে নি, আমার মুখ থেকে হরদম ইংলিশ বেরোয়, নো গ্রামার, কিছু মনে করবেন না। আমার বাবাকে একজন অ্যাংলো ঘুঁষি মেরে নাক ভেঙে দিয়েছিল, তখন থেকেই আমার ওই ভাষাটার ওপর রাগ। অ্যাংলোরা হাফ ইংলিশ বলে, তাতেই আমার বাবার নাক চলে গেল, ফুল ইংলিশ যারা বলে তাদের ঘুঁষি খেলে তো আমার বাবার ফেস্ই পালটে যেত। বলুন ঠিক কি না! আমি তখন থেকে রিভেনজ্ নিতে শুরু করেছি ভাষাটার ওপর, যা মুখে আসে বলব—তুই আমার কাঁচকলা করবি। তোর ভাষা কি আমার মার না বাবার ভাষা!"

তারাপদরা এবার জোরে হেসে উঠল।

গাড়ি ছাড়ল। গাড়ি ছাড়ার সময় যেমন হয়, দু একজন নেমে পড়ল, ছুটতে ছুটতে কে একজন পা দানিতে উঠে পড়ল. প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে কেউ কেউ হাত নাড়ছে, একদল দোহাতী গোছের মানুষ 'গঙ্গা মাই কি জয়' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

ধীরে ধীরে গাড়িটা প্লাটফর্মের বাইরে আসতেই শীতের হাওয়া এসে ঢুকল জানলা দিয়ে।

চন্দন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল, এবার ভেতরে মুখ ফেরাল।

চন্দন বলল, "আপনার নামটা কি স্যার?"

"কিঙ্করকিশোর রায়, দেড়গজী নাম স্যার, ছোট্ করে লোকে বলে কিকিরা দি গ্রেট্।"

জোরে হেসে উঠে চন্দন বলল, "আলেকজান্ডার দি গ্রেট-এর পর আর কোনো গ্রেট্ দেখি নি স্যার, আপনাকে দেখলাম।"

কিকিরা খক্‌খক্ শব্দ করে হেসে উঠলেন। অদ্ভুত সে শব্দ। তারাপদও হেসে উঠল। ঠাট্টা করে চন্দনকে বলল, "তুই তা হলে আলেকজান্ডার দি গ্রেটকে দেখেছিস।"

"ছবি দেখেছি", চন্দন রসিকতা করে বলল।

কিকিরা হাসতে হাসতে বললেন, "এবার জ্যান্ত দেখুন, লিভিং গ্রেট্।"

তারাপদ জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি করেন?"

কিকিরা অলেস্টারের গলার দিকে বোতাম খুলতে খুলতে বললেন, "আমার করার কিছু ঠিক নেই, স্যার। কখনো ছুরি কাঁচির এজেন্ট, কখনো খোস পাঁচড়ার মলমের, কখনো অম্লশূলের ওষুধ বেচে আসি, কখনো আবার অন্য কিছু—যা হাতের কাছে জুটে যায়। আমার নেচারটা অস্থির গোছের। মেজাজে না বনলে আমি কাউকে ছেড়ে কথা বলি না। লাস্ট মান্থে আমি একটা নতুন কম্পানীর স্নো ক্রীম পাউডারের রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলাম। মালিক বেটা ছ্যাঁচড়া, আমার সঙ্গে বনলো না, ছেড়ে দিলাম। দিয়ে এখন একটা কম্পানীর কাঁচি, খুর, ক্লিপের এজেন্ট হয়ে গিয়েছি। হাওড়ায় কারখানা খুলেছেন ভদ্রলোক—বেশ ভালো খুর তৈরি করছে স্যার। আমার সুটকেসে স্যাম্পল আছে। কাল সকালে দেখাব।"

চন্দন হাত নেড়ে বলল, "থাক্ স্যার, খুর আর দেখাবেন না, খুর দেখলেই আমার ভয় করে।"

"ভয়ের কিছু নেই, স্যার। ঠিক মতন টানতে পারলে মাখনের মতন গাল নরম থাকবে। বেকায়দায় টানলে অবশ্য গলা যাবে..." বলে কিকিরা তারাপদর দিকে তাকিয়ে খক্‌খক্ শব্দ করে হাসলেন। তারপর নিজেই বললেন, "সত্যি কথা বলতে কি স্যার, আমি আসলে ম্যাজিসিয়ান ছিলাম। গণপতিবাবু আমার গুরুর গুরু। আমার সাক্ষাৎ গুরু বড় একটা কলকাতায় আসতেন না। তাঁর ফিল্ড ছিল পাটনা, মজঃফরপুর, জামালপুর; ওদিকে বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা—এই সব। আমার গুরু অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা জানতেন। ইন্ডিয়ান ট্রিক বলে তাঁর একটা খেলা ছিল—তাতে তিনি স্টেজের ওপর একটা মেয়ের হাত পা, মুখ সব আস্তে আস্তে অদৃশ্য করে দিতেন। তারপর আবার একে একে সব জোড়া লাগিয়ে দিতেন।"

চন্দন কৌতূহল বোধ করছিল, "বলেন কি"

"মিথ্যে বলব না স্যার, গুরুর নামে কেউ মিথ্যে বলে না।" বলে কিকিরা হাত জোড় করে গুরুর উদ্দেশে প্রণাম জানালেন। "উঁচুদরের লোক ছিলেন তিনি। একবার নাইট্রিক অ্যাসিড খাবার খেলা দেখাতে গিয়ে কি একটা গন্ডগোল হয়ে গেল। তিনি মারা গেলেন। আমি পনেরো বছর বয়েস থেকে তাঁর চেলাগিরি করেছি। সাত আট বছর লেগে ছিলাম। আরও পাঁচ সাতটা বছর সঙ্গে থাকতে পারলে দেখতেন—কিকিরা কি না করত! জাপান, আমেরিকা, লন্ডন করে বেড়াতাম। কপাল স্যার, কপাল,

ব্যাড্ লাক্...।"

তারাপদ জিজ্ঞেস করল, "আপনি নিজেও কি ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াতেন?"

"আমরা ম্যাজিকের বংশ স্যার। আমার ফাদারের অলটারনেট ফাদার বিরাট ম্যাজিসিয়ান ছিলেন।"

জয়ন্ত অবাক হয়ে বলল, "ফাদারের অলটারনেট ফাদার কি জিনিস মশাই?"

কিকিরা মজার মুখ করে হেসে বললেন, "বাবার বাবাকে ছেড়ে তাঁর বাবা—মানে প্রপিতামহ।"

তারাপদ আর চন্দন হেসে গড়িয়ে গেল।

কিকিরা বললেন, "ওটাই তো আমার ওরিজিন্যাল ব্যবসা ছিল স্যার, বছর আট দশ কিকিরা ম্যাজিক মাস্টার হয়ে ছিল; তারপর আমার বাঁ হাতটায় কি যে হল—প্রথমে ব্যথা ব্যথা করত, দেখতে দেখতে হাত শুকোতে লাগল, জোর একেবারে কমে গেল, সব সময় কাঁপত। হাত না থাকলে ম্যাজিসিয়ান হওয়া যায় না। ম্যাজিসিয়ানের হাত, চোখ আর মুখ এই তিনটেই হল আসল।"

চন্দন কি যেন বলতে যাচ্ছিল তার আগেই কিকিরা তার বাঁ হাতটা দেখালেন। সত্যিই শুকনো মতন দেখতে। আঙুলগুলো বেঁকা বেঁকা, চামড়া কেমন পোড়া পোড়া রঙের। হাতটা কাঁপছিল। কোট থাকার জন্যে কব্জির ওপর দেখা গেল না।

চন্দন বলল, "আপনি ডাক্তার টাক্তার দেখান নি?"

"দেখিয়েছি, কত ডাক্তার দেখিয়েছি, ওষুধ খেয়েছি, ইনজেকশান নিয়েছি, কিছু হয়নি। ডাক্তাররা ধরতে পারছে না। কেউ বলছে, নার্ভের রোগ; কেউ বলছে কোনো বিষাক্ত জিনিস থেকে হয়েছে, কেউ আবার অন্য কিছু বলছে—।"

তারাপদ চন্দনকে দেখিয়ে কিকিরাকে বলল, "ও হল ডাক্তার।"

কিকিরা চন্দনের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "বাঃ, বেশ ছেলেমানুষ ডাক্তার।"

চন্দন যেন সামান্য লজ্জা পেল। বলল, "না না এখনও পুরো ডাক্তার হইনি, সবে পাশ করেছি।"

তারাপদ রগড় করে বলল, "চন্দন এখনও দশ বিশটা কেন একটাও মানুষ মারে নি। কাঁচা হাত। দু চার বছর আরও যাক তারপর পাকা ডাক্তার হবে।"

তিনজনেই হেসে উঠল।

হাসি ঠাট্টার কথা বলতে বলতে রাত বাড়তে লাগল। গাড়ি মাঝে মাঝে থামছে, আবার চলছে। শীতের জন্যে জানলা সব বন্ধ। কামরার লোকজন কথাবার্তা বলতে বলতে ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে আসছে। দু একজন ঘুমিয়েও পড়েছে। কিকিরা তৎক্ষণে তারাপদদের নাম ধাম জেনে গিয়েছেন। শুধু জানতে পারেন নি তারাপদরা ঠিক কোথায় যাচ্ছে। ওরা সেই যে বলেছিল মধুপুর টধুপুর তার বেশী আর কিছু বলে নি।

বর্ধমানের পর গোটা কামরাটাই যেন ঘুমিয়ে পড়ল। তারাপদর ঘুম পাচ্ছিল। হাই উঠছিল তার।

হাই তুলতে তুলতে চন্দন হঠাৎ কিকিরাকে বলল, "আপনি তো একজন এক্স-ম্যাজিসিয়ান, আচ্ছা এই যে লোকে মন্তটন্তর কথা বলে, আপনি ওসব বিশ্বাস করেন?"

মাথা নাড়লেন কিকিরা. "না, ম্যাজিক হল খেলা, তার সঙ্গে মন্তটন্তর কোনো সম্পর্ক নেই। তবে আমি হিপ্নোটিজম্, মিসম্যারিজম্ এসব বিশ্বাস করি। নিজে করেছি একসময়। আমাদের দেশে অনেকে যোগ অভ্যাস করে অনেক কিছু করতে পারেন। আমার গুরু মাটির তলায় চাপা দেওয়া অবস্থায় দু তিন ঘণ্টা থাকতে পারতেন।"

তারাপদ আর বসে থাকতে পারছিল না, বড় ঘুম পাচ্ছে। শুয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হতে হতে বলল, "আপনার দু চারটে ম্যাজিক কাল সকালে উঠে দেখব।"

কিকিরা তারাপদকে দেখতে দেখতে হেসে বললেন, "কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, না এখনই দেখবেন?"

"এখন?"

কিকিরা যেন মজা করছেন এমন চোখ মুখ করে বললেন, "একটা স্যাম্প্ল দেখিয়ে দি কি বলেন?" বলে কয়েক পলকের জন্যে চোখ বুজলেন. তারপর বললেন, "আপনি—আপনারা মধুপুর যাচ্ছেন না। কোথায় যাচ্ছেন জানি না—তবে মধুপুর নয়. এমন কোনো জায়গায় যাচ্ছেন যার নামের প্রথমে 'এস্' অক্ষর আছে। রাইট? যার কাছে যাচ্ছেন তার নামের প্রথমে 'ব' অক্ষর থাকবে। রাইট?"

তারাপদ যেন চমকে উঠল। চন্দনও। দুজনেই হতভম্ব; অপলকে কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকল, নিঃশ্বাস নিতেই যেন ভুলে গেছে।

শেষে তারাপদ বলল, "আপনি—আপনি কে?"

কিকিরা খক্ খক্ করে বিচিত্র হাসি হেসে বললেন. "আমি কিকিরা দি গ্রেট, কিকিরা দি ম্যাজিসিয়ান।"

তারাপদ মাথার পাশে তার কিট্ ব্যাগের দিকে তাকাল। ওই ব্যাগের মধ্যে ভুজঙ্গভূষণকে দেবার জন্যে সিল মোহর করা চিঠি আর প্যাকেট আছে একটা। খুব দরকারী জিনিস। মৃণাল দত্ত বার বার সাবধান করে দিয়েছেন। ও দুটো যদি খোয়া যায় সর্বনাশ হবে। তারাপদ যে জন্যে শংকরপুর যাচ্ছে তা ব্যর্থ হবে। এই কিকিরা লোকটা কি সেটা জানে? সে কি সমস্ত জেনেশুনে তারাপদদের পিছু ধরেছে? লোকটার উদ্দেশ্য কি? কোন মতলব নিয়ে সে তাদের সঙ্গী হয়েছে?

তারাপদ ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। চন্দনও যেন বিচলিত, বিমূঢ়।

(ক্রমশ)

ছবি এঁকেছেন ॥ শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

ম্যাজিকের মত / পার্থসারথি চক্রবর্তী

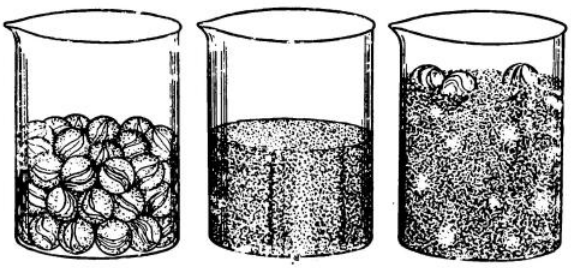

কুড়ি আর কুড়ি যোগ দিলে যে চল্লিশ হবে—এতো সকলেই জানে! এই **যোগফল কখনও কমবেও না, বাড়বেও** না, সবসময় একই থাকবে। কিন্তু কুড়ি সিসি জল আর কুড়ি সিসি এ্যাল-কোহল একটা কাঁচের নলে পুরে এক-সাথে মিশিয়ে খুব ভালো করে ঝাঁকালে এক অবাক করা ব্যাপার-স্যাপার ঘটে, যার ফলে অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মও যায় উল্টে!

এই মজার ভেল্কিবাজীটা দেখানোর আগে ঐ কাঁচের নলের (যেটার গায়ে মাপ নেওয়ার জন্য দাগ কাটা আছে) ভিতর কুড়ি সিসি জল ঢাল। এরপর খুব সাবধানে ওর মধ্যে কুড়ি সিসি এ্যালকোহল ঢেলে নলের খোলামুখ ছিপি এঁটে বন্ধ করে ঝাঁকাও। তুমি অবাক্ হয়ে দেখবে যে, মিশ্রণের আয়তন, মিশ্রণের আগে জল ও এ্যাল-কোহলের যে আয়তন ছিল তার চাইতে কম।

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা খুবই সোজা। এটা বুঝতে হলে তোমাকে একই রকম দুটো বাঁকার নিয়ে তার একটার অর্ধেক বালি দিয়ে ভর্তি করতে হবে। অন্য বাঁকারটির অর্ধেক মার্বেল দিয়ে ভর্তি কর। ধর, এখানে মার্বেলগুলি হচ্ছে এ্যালকোহলের অণু আর বালির দানারা জলের অণু। এইবার বালি আর মার্বেলগুলো একসাথে মিশালে দেখবে তাদের মোট আয়তন, মিশানোর আগের মার্বেল ও বালির আলাদা আলাদা আয়তনের যোগফলের চেয়ে কম। এদের দুটোকে একসাথে মিশালে বালির 'অণুরা' মার্বেল মধ্যেকার ফাঁকা জায়গা-গুলির ভিতর ঢুকে পড়ে। এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এ্যাল-কোহল আর জল একসাথে মিশালে তাদের মোট আয়তন কমে যায় কেন। এ্যালকোহল এবং জলের অণুরা এমন ভাবে সাজান যে তাদের মধ্যে কিছু ফাঁকা জায়গা আছে। এই জায়গাকে তুমি 'পকেট' বলে মনে করতেও পার। এটা অনেকটা মার্বেল মধ্যেকার ফাঁকা জায়গাটির মতন। মিশ্রণের ফলে ওই অণুরা তাই পকেটের শূন্য স্থানে এমনভাবে লুকিয়ে পড়ে যে তাদের মোট আয়তন ম্যাজিকের মত কমে যায়!

ম্যাজিক • যাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র

আজ যে ম্যাজিকটা শেখাবো সেটা এতই সহজ যে তোমরা যখন, তখন যেখানে সেখানে দেখাতে পারবে। তবে হ্যাঁ, কি ভাবে দেখাবে নির্ভর করছে কোথায় দেখাবে তার ওপর। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এই ম্যাজিকটা আমি অনেকদিন আগে প্রখ্যাত চিত্রকর স্বর্গতঃ যামিনী রায়কে দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছিলাম। যামিনীবাবু আমার ম্যাজিক খুব ভালবাসতেন। সময় পেলেই আমায় ম্যাজিক দেখাতে বলতেন। তাঁর ছবি আঁকা দেখার লোভ আমার ছোট বেলা থেকেই। আর সেজন্য কাজের ফাঁকে একটু অবসর পেলেই

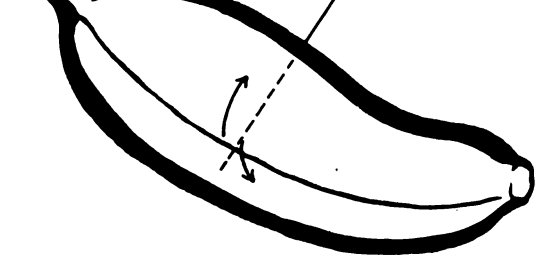

আমি তাঁর স্টুডিওতে হাজির হতাম। তখনই বসতো ম্যাজিকের আসর। সেদিন সকালবেলায় যখন আমি তাঁর বাড়ীতে গেছি, তখন সবে তিনি প্রাতরাশে বসেছেন। সহজ সরল বাঙালী মানুষের বাঙালী খানা—হাতে এক-বাটী মুড়ি, পাশে ছোট্ট একটা প্লেটের মধ্যে পাটালিগুড়, আর একটা কলা। আমি ঘরে ঢুকেই লজ্জায় পড়লাম। ভাবলাম—আমার এই আকস্মিক আবির্ভাব বোধহয় খাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটালো। কিন্তু আমাকে দেখেই তিনি বললেন—"এই যে যাদুপুত্তুর' এসো ব'সো—কিছু খাবে নাকি?" যামিনীবাবু আমায় যাদুপুত্তুর বলে ডাকতেন, আর বাড়ীতে গেলেই কিছু না কিছু খেতে বলতেন। আমি বললাম—"না, কিছু খাবো না—এইমাত্র খেয়ে এসেছি।" তিনি নাছোড়বান্দা ; বললেন "আচ্ছা ঠিক আছে—এই কলাটা আমরা দুজনে ভাগ করে খাচ্ছি। তুমি অর্ধেক, আমি অর্ধেক।" হাতের কাছে তিনি ছুরিটা খুঁজে পেলেন না—বললেন—"দাঁড়াও আমি ছুরিটা নিয়ে আসি।" আমার আপত্তি তিনি শুনলেন না, পাশের ঘর থেকে ছুরিটা আনতে চলে গেলেন।

ইতিমধ্যে আমি কলাটা হাতে নিয়ে একটা কাজ সেরে রাখলাম। কি করেছিলাম—সেটা পরে বলছি। যাই হোক—তিনি তো ছুরিটা নিয়ে এলেন। আমি বললাম—"কলাটা যখন ভাগ করতে চাইছেন তখন ছুরি আনবার কি প্রয়োজন ছিল, ম্যাজিক করলেই হতো, ম্যাজিক করেই তো ওটাকে ভাগ করা যায়। যামিনীবাবু হেসে বললেন,—"করো তাহলে যাদু" আমি বললাম, "কলাটা আপনি হাতে নিন; দেখুন ওটা সম্পূর্ণ আস্ত এবং খোসা একদম ছাড়ানো নেই— তাই তো? এবার আপনি ঐ কলাটাকে যে কটা ভাগে ভাগ করতে চান ততবার ফুঁ দিন, দেখবেন ঐ ফুঁ-এর জোরে কলাটা ভাগ হয়ে যাবে। যামিনীবাবু একটু মুচকে হেসে কলাটাকে দুবার ফুঁ দিলেন। কলাটার কিন্তু কিছু হলো না—যেমন ছিল তেমনই রইলো। তিনি বললেন, "কৈ, ভাগ হলো না তো!" আমি বললাম, "বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না, খোসাটা ছাড়ালেই দেখতে পাবেন কেমন সুন্দর দু-ভাগ হয়ে গেছে।" যামিনীবাবু আমার কথা মতো কলাটাকে আস্তে আস্তে ছাড়াতে শুরু করলেন। কি অদ্ভুত! কলাটা ভেতরে ঠিক মাঝখানে দুটুকরো হয়ে রয়েছে। খুব খুশী হয়েছিলেন তিনি এই ম্যাজিকটা দেখে।

তোমরাও নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছো কি ভাবে হলো এটা! কলার খোসা ঠিক রয়েছে অথচ ভেতরটা কি করে কাটা হলো? তাই নয় কি? যামিনী

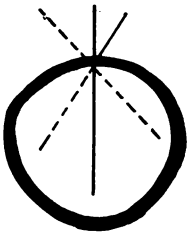

বাবু যখন ছুরি আনতে পাশের ঘরে গিয়েছিলেন তখনই আমি আমার কৌশলটা সেরে নিয়েছিলাম। আর সেটাই এখন তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি। আমি করেছিলাম কি, একটা ছুঁচ কলাটার ঠিক মাঝখানে ফুটিয়ে ছুঁচটা ঘুড়িয়ে ঘুড়িয়ে কলাটার ভেতরের অংশটা কেটে ফেলেছিলাম, কাটা হয়ে যাবার পর ছুঁচটা বের করে নিলে বাইরে থেকে তার কিছুই বোঝা যাবে না। এইভাবে ছুঁচ ফুটিয়ে কলাটাকে অনেক ভাগেই ভাগ করা যায়—বাইরে থেকে কিছু বুঝতে পারা যাবে না। তোমরা একটু অভ্যাস করে বন্ধুদের দেখিও—দেখবে তারা কেমন অবাক হয়ে যাচ্ছে।

রাজা হওয়ার

আগে যা ঘটেছে

আজ থেকে কয়েক শো বছর আগের কথা। বোম্বাগড় নামে এক দেশ ছিল। চারদিকে সমুদ্রে ঘেরা, মধ্যে এক বিরাট রাজ্য। সেই রাজ্যের মহারাজার নাম কন্দর্পনারায়ণ। মহারাজা কন্দর্পনারায়ণের অগাধ সম্পত্তি। তিনি একদিন তাঁর রাজ-পুরোহিত, মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি সকলকে তাঁর দরবারে ডাকলেন। তাঁর দুই ছেলে কীর্তিনারায়ণ আর কান্তিনারায়ণ, তাঁদেরও ডাকলেন। ডেকে জানালেন যে তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়েছে। সুতরাং রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী তিনি অবসর গ্রহণ করতে চান। অর্থাৎ তিনি বানপ্রস্থে যাবেন। যাবার আগে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দুই ছেলেকে আধাআধি ভাগ করে দিয়ে যেতে চান। কিন্তু মুশকিল হয়েছে একটা মরকতমণি নিয়ে। সেই মণিটার দাম এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা। যেহেতু মণিটাকে কেটে দু'ভাগে ভাগ করা যায় না তাই তিনি সেটা দুই ছেলের কাউকেই দিতে চান না। দিতে চান এমন একটা লোককে যে সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বোধ বলে বিবেচিত হবে। তিনি প্রস্তাব দিলেন যে তাঁর দুই ছেলের মধ্যে যে সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বোধ লোককে খুঁজে বার করতে পারবে তাকেই তিনি সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত বলে স্থির করবেন। প্রস্তাবটা শুনে সবাই প্রথমে অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু মহারাজার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কেউই কিছু বলতে সাহস করলেন না। মুখে সবাই প্রস্তাবটা সমর্থন করলেন। এর পর মহারাজা বানপ্রস্থে চলে গেলেন। মন্ত্রী ভূপ-নারায়ণ সিং মহারাজার অবর্তমানে তাঁর মুকুট শুন্য-সিংহাসন বসিয়ে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। কিন্তু মহারাজার দুই ছেলের মধ্যে তখন মনে-মনে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। দু'জনের মধ্যে কে সব চেয়ে বোকা লোক আবিষ্কার করতে পারবে তারই প্রতিযোগিতা। যার আবিষ্কার করা বোকা লোক দু'জনের বোকা লোকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঠিক হবে তাকেই মরকতমণিটা দেওয়া হবে আর সেই শ্রেষ্ঠ বোকা লোককে যে আবিষ্কার করেছে সেই ছেলেকেই মহারাজা সিংহাসনে বসবার অধিকার দেবেন। তখন তার রাজ্যাভিষেক হবে। সেই ছেলেকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে মহারাজা যেমন বানপ্রস্থে ছিলেন তেমনি আবার বানপ্রস্থে ফিরে যাবেন।

কিন্তু ছ'মাস মাত্র সময়। এই ছ'মাসের মধ্যেই বোকা লোক খাছাই শেষ করতে হবে। মহারাজা বাণপ্রস্থে যাবার সময় এই সময়-সীমাও বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং কীর্তিনারায়ণ আর কান্তিনারায়ণ দু'জনেই তখন ব্যস্ত হয়ে উঠলো। দু'জনেই হুকুম করলো মন্ত্রীমশাইকে—তাড়াতাড়ি বোকা লোক খুঁজে বার করে দিন। মন্ত্রীমশাই হুকুম করলেন কোটালকে। কোটাল হুকুম করলেন সেনাপতিকে। কিন্তু সারা রাজ্য খুঁজেও কোথাও বোকা লোক পাওয়া গেল না। সব জায়গার লোকই বললে—আমাদের এ-দেশে বোকা লোক কেউ নেই।

কীর্তিনারায়ণ একদিন মন্ত্রীমশাইএর কাছে গিয়ে হাজির। গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী হলো খুড়োমশাই, আমার বোকা লোক খুঁজে পাওয়া গেছে?

ভূপনারায়ণ সিং বললেন—না বাবাজী, এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে কোটালমশাই এখনও হাল ছাড়েন নি, তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন—

কীর্তিনারায়ণ বললে—আমাদের দেশে একটা বোকা নেই? আপনি বলছেন কী, খুড়োমশাই? চালাক-চতুর লোক না পাওয়া যাক, কিন্তু বোকা লোক খুঁজে বার করা এমন কী শক্ত কাজ?

মন্ত্রীমশাইবললেন—আমারও তো সেই ধারণাই ছিল বাবাজী, কিন্তু এখন দেখছি উল্‌টো।

—তাহলে কী হবে? মাত্র ছ'মাস সময় হাতে। তার মধ্যে কি বোকা খুঁজে পাওয়া যাবে?

মন্ত্রীমশাই বললেন—নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তুমি অত ভেবো না, আমি ঠিক বোকা খুঁজে বার করে দেব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—

কীর্তিনারায়ণ নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল। কিন্তু সে চলে যাবার পরই মন্ত্রীমশাইএর কাছে এসে হাজির হলো কান্তিনারায়ণ।

কান্তিনারায়ণ কাঁদন থেকেই তাগিদ দিচ্ছিল মন্ত্রী-মশাইকে। মন্ত্রীমশাইও বরাবর তাকে ভাবতে বারণ করছিলেন। কিন্তু তাতে কান্তিনারায়ণ মনে শান্তি পাচ্ছিল না। বোকা খুঁজে বার করতে যত দেরি হবে তার রাজা হতেও তত দেরি হবে। তা ছাড়া দাদার বোকার সঙ্গে তার বোকার আবার তুলনা করা হবে। দু'জন বোকার মধ্যে কে বেশি বোকা আর কে-ই বা কম বোকা তারও বিচার হবে। তবে তো রাজা হতে পারবে কান্তিনারায়ণ! এ তো সোজা রাজা হওয়া নয়! এ-রাজ্যের রাজা হওয়াতে তো অনেক রকম ঝকমারি পোয়াতে হবে।

সোজাসুজি রাজা হতে পারলে অনেক ল্যাঠা চুকে যায়। বাবা বনে চলে গেলেই বড় ছেলে তার সিংহাসনে গিয়ে বসে—এইটেই বরাবরের নিয়ম। বোম্বাগড়েও বরাবর এই নিয়মই মানা হয়েছে। কিন্তু এবার হঠাৎ বাবার কী খেয়াল হলো তিনি এক নতুন নিয়ম জারি করে গেলেন।

দুই ভাইএর মধ্যে কান্তিনারায়ণ ছোট। ছোটবেলা থেকে সে জেনে এসেছে যে দাদাই রাজা হবে। কারণ দাদা বয়েসে বড়। সেই তখন থেকে তাই সে দাদাকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো, দাদার সঙ্গে ভাব রাখতো। যাতে দাদা তার ওপর খুশী থাকে। দাদা যদি খুশী থাকে তো পরে দাদা যখন রাজা হবে তখন তার ছোট ভাইকেও কিছু সুযোগ-সুবিধে দেবে! আর ঝগড়া করলে ছোট ভাইএর কোনও সুবিধেই নেই। রাজার সঙ্গে ঝগড়া করে সে রাজ্যে টিকতে পারবে না। তখন অনেক অসুবিধেয় পড়তে হবে তাকে।

মাঝে-মাঝে যখন দুই ভাইতে কোনও একটা বিষয় নিয়ে রাগারাগি হতো তখন কান্তিনারায়ণ মা'র কাছে গিয়ে নালিশ করতো।

বলতো—মা, দেখ না, দাদা খালি আমাকে মারছে—

মা জিজ্ঞেস করতো—কেন, তোমাকে কীর্তি কেন মারছে? তুমি কিছু দোষ করেছিলে বুঝি?

ঝকমারি

বিমল মিত্র

উপন্যাস

কান্তি বলতো—না মা, আমি কিছু দোষ করিনি, দাদা শুধু-শুধু আমাকে মারছে—

বড় ভাই কীর্তিকে ডাকা হলো।

মা তাকে জিজ্ঞেস করলে—তুমি মারছো কেন ছোট ভাইকে?

কীর্তি বললে—আমি কি ওকে আগে মেরেছি? ও-ই তো আগে আমার মাথার চুল টেনে দিলে। আমি কিছু জানি না, বিছানায় শুয়ে ছিলুম, ও হঠাৎ কোথা থেকে এসে আমার মাথার চুল টেনে দিয়ে পালিয়ে গেল—

মা কান্তির দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেন, ও ঘুমোচ্ছিল, তুমি ওর মাথার চুল টানতে গেলে কেন?

কান্তি বললে—বা রে, তুমি কেবল আমারই দোষ দেখ, আমি আবার কখন ওর মাথার চুল টানলুম?

মা বললে—নিশ্চয় চুল টেনেছ তুমি, নইলে তোমার দাদা কি মিছে কথা বলছে? জানো কীর্তি একদিন রাজা হবে। এখন থেকে যদি দাদার সঙ্গে ঝগড়া করো তাহলে পরে তোমাকেই ভুগতে হবে—

কান্তি বললে—কেন, দাদা রাজা হবে কেন? ও একলা কেন রাজা হবে? ও যদি রাজা হয় তাহলে আমিও রাজা হবো—

মা বললে—না, ও-কথা বলতে নেই ছিঃ, দুজনে কি একসঙ্গে রাজা হয় কখনও? একটা দেশের একজনই রাজা হয় বরাবর—তা জানো না তুমি?

কান্তি বুঝতে চাইলে না কথাটা।

বললে—না, তা কিছুতেই তা হতে দেব না। দাদা যেমন তোমার ছেলে আমিও তেমনি তো তোমার ছেলে। ও কেন তাহলে রাজা হবে?

মা বললে—হবেই তো, ও যে তোমার চেয়ে বয়েসে বড়—ও যে বাড়ির বড় ছেলে—

কান্তি কথাটা শুনে কিছুক্ষণ ভাবলে। তারপর বললে—তা দাদা বড় ছেলে হোল কেন? আমি কেন

তোমার বড়ছেলে হলুম না? আমি কী দোষ করেছি?

এমনি করেই কারণে-অকারণে কীর্তি আর কান্তিতে খিটিমিটি বাধতো। দুই পিঠোপিঠি ছেলে। বাবা-মা দু'জনকেই সমান ভালোবাসতো। বাবা-মায়ের কাছে স্নেহ-ভালবাসার দিক দিয়ে কেউই ছোট-বড় নয়। কিন্তু সিংহাসন তো একটা। বোম্বাগড়কে তো আর দু'টো ভাগ করে দু'টো দেশের দু'টো সিংহাসন বা দু'জনকে রাজা করা যায় না।

রাণী রাজার কাছে গিয়ে বলতো--জানো, আজকে তোমার কান্তি কী বলছিল?

কী? কী বলছিল?

—বলছিল কীর্তি কেন রাজা হবে। কান্তি কী দোষ করেছে যে, সে রাজা হবে না?

এই সব কথা এখন থেকেই ওরা ভাবে বুঝি? এত ছোটবেলা থেকেই যদি সিংহাসনের ওপর লোভ থাকে ওদের, তাহলে তো বড় হয়ে ওরা ঝগড়া-মারামারি করবে—! তাহলে তো এখন থেকেই ভাবতে হয়।

রাণী বলতো—কী ভাববে?

রাজা বলতেন—ভাববো আমি কাকে সিংহাসনে বসাবো—

রাণী বলতো—তা সিংহাসনে কাকে বসাবে তা নিয়ে আর ভাববার কী আছে? কীর্তিকেই তো সিংহাসনে বসাবে তুমি। সে বড় ছেলে, সিংহাসনে বসবার অধিকার তো তারই। বরাবর তাই-ই তো হয়ে এসেছে। সেইটাই তো নিয়ম। তুমি তো আর তোমার ইচ্ছেমত নিয়ম বদলাতে পারো না!

রাজা বলতেন—কেন নিয়ম বদলাতে পারবো না? আমি বোম্বাগড়ের রাজা। আমি নিয়ম তৈরি করবো আবার আমিই সে-নিয়ম ভাঙবো। আমার মুখের ওপর কে কথা বলবে?

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করতেন—আচ্ছা, দু'জনের মধ্যে কে বেশি বুদ্ধিমান বলে তোমার মনে হয় বলো তো?

রাণী বলতো—আমার তো মনে হয় দু'জনেই সমান বুদ্ধিমান।

—সমান বুদ্ধিমান কখনও হতে পারে? একটু উনিশ-বিশ নিশ্চয়ই আছে!

রাণী বলতো—তা হয়ত আছে, কিন্তু তাবলে তুমি কান্তিকে সিংহাসনে বসাতে পারবে না। সে ছোট ছেলে, সে কী করে রাজা হবে—? তাকে রাজা করলে কীর্তি কী ভাববে। সে তো রেগে যাবে—

রাজা বলতেন—যাক্ গে, তা নিয়ে এখন ভাববার দরকার নেই। তার তো এখন অনেক দেরি আছে। আগে আমার পঞ্চাশ বছর বয়েস হোক, পঞ্চাশ বছর বয়সের আগে তো আর কারো রাজা হবার কথা উঠছে না—এখন তো আমিই আছি—

এসব কথা অনেক কাল আগেকার। তখন কীর্তি আর কান্তি অনেক ছোট। দু'জনেই তখন রাজগুরুর কাছে পড়াশোনা করে। জ্যোতিষ পড়ে, ব্যাকরণ পড়ে। মহারাজা কন্দর্পনারায়ণ ছেলেদের শিক্ষার ভার দিয়েছিলেন রাজগুরু দারকেশ্বর চক্রবর্তীর কাছে। রাজগুরু খুব মনোযোগ দিয়ে রাজপুত্রদের লেখা-পড়া শেখাতেন।

মহারাজা একদিন রাজগুরুর কাছে গেলেন। রাজগুরুর পদবন্দনা করে জিজ্ঞেস করলেন—রাজপুত্রদের শিক্ষা-দীক্ষা কেমন এগোচ্ছে?

রাজগুরু রাজার এই প্রশ্নে একটু অবাক হলেন—কেন মহারাজ, ও-কথা জিজ্ঞেস করলেন—কেন? তারা কি কোনও অন্যায় আচরণ করেছে?

—না, তা নয় এমনি জিজ্ঞেস করছি। জানতে চাইছি ওদের বুদ্ধি-বিবেচনা-মেধা-শক্তি কেমন?

রাজগুরু বললেন—খুবই ভালো।

—তা দু'জনের মধ্যে বিদ্যা-বুদ্ধিতে কম-বেশি কে? কীর্তি, না কান্তি?

রাজগুরু বললেন—এখন তো সবে ওদের বাল্যকাল। শিক্ষা-দীক্ষার অনেক বাকি। এখন ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম চলছে ওদের। বিদ্যা-শিক্ষার এখন অনেক কাল বাকি। এখন এত আগে সে-সম্বন্ধে মতামত দেওয়া যায় না। তবে মনে হয় বুদ্ধি-বিবেচনা-মেধা-শক্তিতে দু'জনেই সমান পারদর্শী!

মহারাজ রাজগুরুর কথাগুলো শুনলেন। কিন্তু কিছু মতামত প্রকাশ করলেন না। অবশ্য এত আগে মতামত প্রকাশ করাও শক্ত। কিন্তু তখন কেউ-ই বুঝতে পারেনি যে, মহারাজা সকলকে কেন, ওই প্রশ্ন করতেন। রাণীও বুঝতে পারেনি। মন্ত্রীমশাই, কোটাল, সেনাপতি, রাজগুরু কেউই না। কবে মহারাজার পঞ্চাশ বছর বয়েস হবে, কবে তিনি বানপ্রস্থে যাবেন, তার এতকাল আগে থেকে তিনি তাঁর সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর কথা ভাবছেন কেন? সে তো এখন অনেক দূরের কথা।

কিন্তু যতই সময় যেতে লাগলো মহারাজা কন্দর্প নারায়ণ যেন ততই ভাবনায় জড়িয়ে পড়লেন। তাঁর জীবন তো কাটছে। কিন্তু চিরকাল তো তিনি থাকবেন না। তাঁর অবর্তমানে দেশের কী হবে, তখন প্রজারা এই রকম সুখে থাকবে কি না তার ব্যবস্থা তো তাকেই করে যেতে হবে। যে-রাজা শুধু নিজের সুখের কথা ভাবে সে স্বার্থপর রাজা। কিন্তু যে-রাজা নিজের সুখ সাচ্ছন্দের চেয়ে দেশের প্রজাদের সুখ-সাচ্ছন্দ, দেশের প্রজাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবে সে-ই তো সত্যিকারের আদর্শ রাজা। রাজা কন্দর্পনারায়ণ তাঁর বাবার কাছ থেকে এই শিক্ষাই পেয়ে এসেছেন আর সেই রকম ভাবেই রাজ্য-শাসন করে আসছেন। তাঁকে এমন ব্যবস্থা করে যেতে হবে, তাঁর সিংহাসনে এমন এক রাজাকে বসিয়ে যেতে হবে যে প্রজাদের নিজের সন্তানের মত সেবা করবে।

রাণী মহারাজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করতো—কী ভাবছো এত?

মহারাজা বলতেন—না, কিছু না--

—প্রজাদের কিছু অসুবিধা হচ্ছে?

মহারাজা বলতেন—না—

—তাহলে? তোমার শরীর খারাপ? তাহলে বৈদ্যকে খবর দাও না।

মহারাজা বলতেন—না, তাও না। আমি ভাল আছি—

—কিন্তু কী ভাবছো তা বলো না। আজকাল তো দেখছি তুমি সমস্তক্ষণ কী ভাবো। এত ভাবনা তোমার কীসের তা তো বুঝতে পারি না।

মহারাজার ভাবনার আসল কারণ কেউ-ই তখন বুঝতে পারতো না। অথচ কীর্তি আর কান্তি তখন বেশ বড় হয়েছে। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম ছেড়ে সংসারাশ্রমে এসে পৌছেছে। এবার তাঁর নিজেরও বয়েস হতে

চলেছে। আর তো বেশি দিন নয়।

রাণী একদিন বললেন—কীর্তি আমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছিল—

—কী কথা?

—বলছিল অভিষেকের সময়ে তার একটা হীরে বসানো পাগড়ি চাই—

অভিষেকের কথা ভাবছে। সে কি ধরেই নিয়েছে যে, সে রাজা হবে। রাজা হওয়ার জন্যে যার এত লোভ সে কি রাজ্য চালাতে পারবে? মানুষের বড় শত্রুই তো হলো লোভ। সিংহাসনের ওপর লোভ, ক্ষমতার ওপর লোভ, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির লোভই তো মানুষকে নষ্ট করে। বিশেষ করে রাজার পক্ষে। প্রজার চরিত্র নষ্ট হলে রাজ্য রসাতলে যায় না, কিন্তু রাজাকে হতে হবে নির্লোভ, সদাচারী, বুদ্ধিমান, নীতিবান, গুণবান। রাজা লোভী হলে সে-রাজ্য ধ্বংস হতে বাধ্য। সেই ধ্বংস থেকে কেউ সেই রাজ্যকে রক্ষা করতে পারবে না। রাজা যেমন শিষ্টের পালন করবে তেমনি দুষ্টের দমনও করবে। তা করতে গেলে রাজাকে সৎ হতে হবে নির্ভীক হতে হবে। সেই রাজাই তো শ্রেষ্ঠ রাজা যে, নিজেকে ভগবানের প্রতিনিধি মনে না করে প্রজাদের প্রতিনিধি মনে করবে।

শেষের দিকে কন্দর্পনারায়ণের বড় ভাবনা হতো। কিন্তু তা কারোর কাছে প্রকাশ করতেন না। পূর্ব-পুরুষের প্রতিষ্ঠা করা সিংহাসন, পিতৃপুরুষের স্মৃতি-জড়ানো দেশ—এই সিংহাসন এই দেশ এমন একজনের হাতে দিয়ে যাওয়া চাই যে এর মর্য্যাদা বজায় রাখতে পারবে, যে এর সম্মান অক্ষত রাখতে পারবে। তাই তিনি কীর্তি আর কান্তিকে দূর থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। শুধু তো লেখা-পড়া শিখলেই কেউ মানুষ হয় না, তার সঙ্গে চাই চরিত্র। সেই চরিত্রই যদি কারো গড়ে না ওঠে তাহলে সে মানুষ নামের যোগ্য হয় না।

আর রাজা? রাজা হওয়া? সে তো আরও শক্ত! শুধু বিদ্যা-বুদ্ধি-চরিত্র থাকলেই হবে না। তার সঙ্গে চাই ত্যাগ। রাজ্যের ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি, সম্মান সব কিছু ত্যাগ করে ভোগ করতে যে পারবে, একমাত্র সে-ই কেবল রাজা হওয়ার যোগ্য হবে।

এই রকম দুর্ভাবনার মধ্যে যখন তিনি দিন কাটাচ্ছেন তখন একদিন তিনি রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা স্বপ্ন দেখলেন।

স্বপ্ন দেখলেন যেন বিশালাক্ষী দেবী তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বিশালাক্ষী দেবী বোম্বাগড়-রাজার গৃহ-বিগ্রহ। তাঁকে দেখেই কন্দর্পনারায়ণ তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। জিজ্ঞেস করলেন—মা, তুমি?

বিশালাক্ষী বললেন—তুই আমাকে এত ডাকছিস আর আমি কখনও সে ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারি? তোর এত কীসের ভাবনা?

কন্দর্পনারায়ণ বললেন—আমার তো বয়েস হচ্ছে মা, আমি পঞ্চাশ বছর বয়েসে পা দিতে যাচ্ছি, এবার বাণপ্রস্থ-আশ্রমে যাবার সময় হয়েছে। আমার দুই ছেলের মধ্যে কাকে এই বোম্বাগড়ের সিংহাসন দিয়ে যাবো, কীর্তিকে দেব না কান্তিকে দেব, এই নিয়ে বড় ভাবনায় পড়েছি—। এ-বংশের নিয়ম রাজার বড় ছেলেই রাজ-সিংহাসনে বসবার অধিকারী হয়। কিন্তু আমার বড় ছেলে কীর্তি-নারায়ণ বড় লোভী। এখন থেকেই সে হীরে বসানো পাগড়ি পড়তে চায়—

বিশালাক্ষী দেবী বললেন—তাহলে এক কাজ কর—তোর রাজকোষে একটা দামী মরকতমণি আছে. জানিস তো?

—না মা, আমি তো জানি না।

—হ্যাঁ, আমি জানি। আজ রাজকোষে ঢুকে দেখবি আমি যা বলছি তা মিথ্যে নয়, সত্যি। তোর দুই ছেলে, তাদের দুজনের কাউকেই ওটা দিস্‌নি—। দিবি এমন একটা লোককে যে সব চেয়ে বোকা—

—বোকা?

বিশালাক্ষী দেবী বললেন—হ্যাঁ, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বোকা আর তোর দুই ছেলের মধ্যে যে ছেলে সব চেয়ে বোকা লোককে খুঁজে বার করতে পারবে, তাকেই বসাবি সিংহাসনে।

—আর মরকতমণিটা?

—মরকতমণিটা দিবি সেই বোকা লোকটাকে।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মা অন্তর্ধান করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল মহারাজার। চোখ মেলে চারদিকে দেখলেন কেউ কোথাও নেই। একবার ভাবলেন কথাটা মাহারাণীকে বলবেন। কিন্তু না, মহারাণীকে বলবার দরকার নেই। শুধু মহারাণীকে নয়, বোম্বাগড়ের কাউকেই বলবার দরকার নেই। স্বপ্নটা তিনি মনে-মনে চেপে রাখলেন। তারপর অনেক রাত্রে কোষাগারে গিয়ে প্রহরী-সর্দারকে তাঁর রাজকোষ দেখবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। প্রহরী-সর্দার মহারাজার দুচোখ কাপড় দিয়ে ভালো করে বেঁধে দিয়ে তাঁকে কোষাগারের ভেতর নিয়ে গেল। সেখানে পিতৃ-পুরুষের বহুকালের জমানো ঐশ্বর্য্য-সম্ভার দেখে তিনি এক-এক করে সমস্ত পরীক্ষা করতে লাগলেন। কত কালের কত মূল্যবান সব সামগ্রী।

সোনা-রুপো-হীরে-মোতি-পান্না-চুনীর সমারোহ। এই প্রথম এ-রকম অভিজ্ঞতা তাঁর। তারপর দেবী বিশালাক্ষী যা বলেছিলেন তাই-ই সত্য হলো। একটি মাত্র মরকতমণি পাওয়া গেল। তার আর জোড়া নেই। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন সেখানার দাম হবে প্রায় এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা।

প্রহরী-সর্দার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল।

মহারাজার ভাব-ভঙ্গী দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

একবার বললে—মহারাজ, রাত শেষ হয়ে এসেছে—

এতক্ষণে যেন মহারাজার সম্বিত ফিরে এল। তিনি কিছু না বলে মরকতমণিটা রেখে দিলেন। তারপর আবার তাঁর চোখ বেঁধে দেওয়া হলো দোপাট্টা কাপড় দিয়ে। তিন প্রহরী-সর্দারের হাত ধরে কেউ জানবার আগেই আস্তে আস্তে কোষাগারের ফটক পেরিয়ে বাইরে এলেন।

এ-ঘটনা কেউই জানতো না। জানতো শুধু সেই কোষাগারের প্রহরী-সর্দার। কিন্তু কেন যে তিনি হঠাৎ কোষাগারে ঢুকেছিলেন, দেবী বিশালাক্ষী যে তাঁকে স্বপ্ন দিয়েছিলেন সে-সব কথা তার জানবার নয়। এর পর তিনি একদিন তাঁর দরবারে মন্ত্রী আর সভাসদদের ডেকে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন।

বাণপ্রস্থে গিয়ে মহারাজা ভালোই ছিলেন। নিরুদ্বেগ নিরাসক্ত জীবন। সরল বাসনা-রহিত দিন-যাপন। আর কোনও চিন্তা নেই তাঁর। রাজ্যের কিংবা প্রজাদের ভালো-মন্দ-সুখ-সুবিধে কোনও কিছুই আর তাঁকে আগেকার মত উদ্বিগ্ন করে না। নিজের জীবনের শেষ ক'টা দিন এমনি করে কাটাতে পারলেই তিনি মনে করবেন তার জীবন সার্থক হয়েছে। আর কিছু তাঁর চাইবারও নেই, কাউকে কিছু দেবারও নেই। ঈশ্বর-চিন্তাতেই তিনি শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেবেন।।

সেদিন তিনি তাঁর আশ্রমের সামনে বিশ্রাম করছিলেন। একটা হরিণ-শিশু তাঁর পায়ের কাছে বসে জাবর কাটছিল। হঠাৎ হরিণ-শিশুটা কান খাড়া করে উঠল।

—কে?

মহারাজা সামনের দিকে চেয়ে দেখলেন। কানে এল ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরের শব্দ। ঘোড়ায় চড়ে কে একজন তাঁর আশ্রমের দিকেই আসছে। কাছে আসতেই চিনতে পারলেন অশ্বারোহী আর কেউ নয়—মন্ত্রী ভূপনারায়ণ সিং। মন্ত্রী কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে মহারাজকে অভিবাদন জানালেন।

মহারাজা জিজ্ঞেস করলেন—কী খবর মন্ত্রী? রাজ্যের সব কুশল তো?

মন্ত্রী বললেন— হাঁ মহারাজ, দেবী বিশালাক্ষীর প্রসাদে সবই কুশল।

মহারাজা আবার জিজ্ঞেস করলেন—রাজ্যের চাষ-বাস-ফসলের অবস্থা কেমন? আমার প্রজাদের কোনও অভিযোগ-অভাব নেই তো?

—হ্যাঁ মহারাজ, রাজ্যের সকলের মঙ্গল। কোথাও কোনও অভাব-অভিযোগ নেই। শুধু একটা সংবাদ দিতে আপনার কাছে এসেছি—

—কী সংবাদ?

মন্ত্রী বললেন—কোথাও কোনও বোকা লোক পাওয়া যাচ্ছে না।

—সে কী?

হ্যাঁ মহারাজ, কোটাল নরহরি ভদ্র সেনাপতিকে হুকুম দিয়েছিল বোকা লোক খুঁজে বার করে আনতে। সেনাপতিও সেপাইদের সে-হুকুম পালন করতে বলে দিয়েছিল। কিন্তু একটা পুরো মাস তারা সবাই মিলে চেষ্ট করেও সারা রাজ্যে বোকা লোক খুঁজে বার করা গেল না। আর মাত্র পাঁচ মাস সময় আছে হাতে। এখন এই অবস্থায় আমি কি করবো বুঝতে পারছি না। রাজপুত্র-রাও বড় অস্থির হয়ে উঠেছেন। বড় রাজপুত্র তো আমার কাছে এসে প্রায়ই তাগিদ দিচ্ছেন। প্রায়ই বলছেন—আর কত দেরি? বলছেন সবাই নাকি অপদার্থ। তিনি রাজা হয়ে আমাদের সকলকে বরখাস্ত করবেন—

—আর কান্তি?

মন্ত্রী বললেন—ছোট রাজপুত্র? ছোট রাজপুত্রও তাগিদ দেন, বড় রাজপুত্রের মত অমন করে নয়। ছোট রাজপুত্র আমাদের সমস্যাটা বুঝতে পারছেন। ছোট রাজপুত্র তো বরাবরই ধীর-স্থির-গম্ভীর প্রকৃতির!

তারপর একটু থেমে বললেন—এখন এই অবস্থায় আমি কী করবো তা-ই আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলাম। আর সময়ও তো হাতে বেশি নেই, আপনি যেমন পরামর্শ দেবেন আমি সেই মত কাজ করবো—

(ক্রমশঃ)

ছবি এঁকেছেন ॥ সুধীর মৈত্র

ছড়া জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়।

ফুল ফল ঘাস
থাকে যদ্দি চিরকাল
থাক বারোমাস।
থাক ভরে থাক।
ছোটখাটো আমাদের
অনেক আবাস।
পাখি নদীজল
অপরূপ ইচ্ছার মতো অবিকল।
ধানক্ষেত আমজাম পাতাঢাকা গাছ
খালবিল ভরে থাক কচিকুচো মাছ।

শহরের রাস্তায়
লরি ট্রাক্ যায়
থাকে ট্রাম-বাস—
ফুটপাতে দুটি পাশে
নানা গৃহাবাস
থাক তারা থাক
বারোমাস জুড়ে থাক
সহাস সবাক।
মানুষের সংসার জুড়ে হাঁকডাক
শহরেও থাক তারা গ্রামেতেও থাক

শহরের থেকে গ্রামে নিয়ে যাবে ডাক।
আর থাক মাঝখানে মানুষের মন
পৃথিবীর মতো বড় হয়তো অমন
চিরকাল বারোমাস থাক অকৃপণ ॥

আজব চিড়িয়াখানা

বহুরূপী

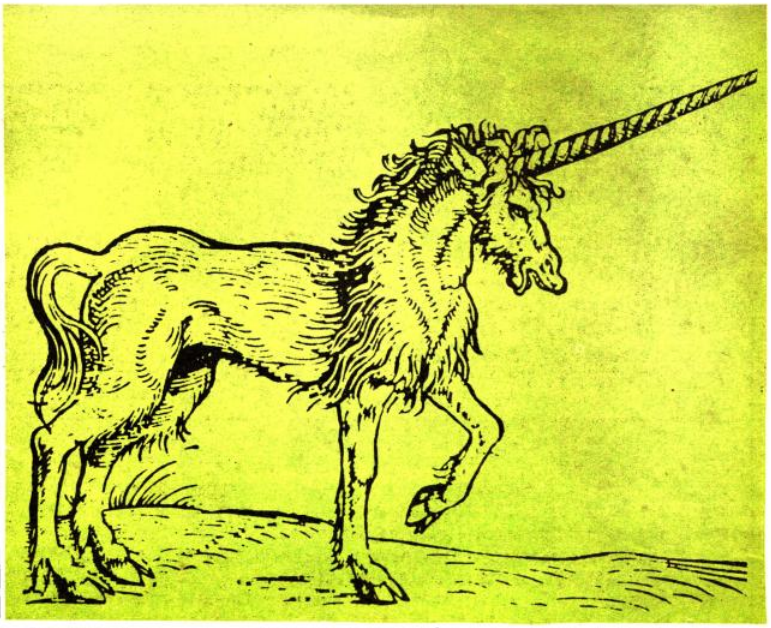

বলতে পার যিশুর জন্ম কবে? সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে অনেকেই বলে দেবে—এক হাজার নয়'শ পঁচাত্তর বছর আগে। এ হিসেবটা কিন্তু মোটেই কঠিন নয়। তারও চারশ' বছর আগের কথা। একজন গ্রীক পণ্ডিত একটা খবর বলে সবাইকে একদিন চমকে দিলেন। বনের খবর। তিনি বললেন—ভারতে এক ধরনের বুনো গাধা আছে। তার গায়ের রঙ ধবধবে সাদা, মাথাটা লালচে, আর চোখ দুটি ফুটফুটে নীল। আর তার চেয়েও আজব ব্যাপার, সে গাধার কপাল ফুঁড়ে বের হয়েছে মস্ত ধারালো একখানা শিং। হ্যাঁ, একখানা।

কথাটা ঠিক। সাক্ষী দিলেন একজন রোমান পণ্ডিত। তবে কি জান, জন্তুটা ঠিক গাধা নয়। ওর শরীর আসলে ঘোড়ার মতো। আর মাথাটা অবিকল হরিণ যেন। তাছাড়া, পায়ে ওর খুর নেই। তবে সে-সব কিছু নয়, আসলে দেখবার জিনিস ওই শিংটা। কপালের ঠিক মধ্যিখানে।

সেই থেকে সকলের মুখে মুখে সেই আজব জন্তুর গল্প। নাম দেওয়া হল তাকে—ইউনিকর্ণ। শব্দটা বাংলা বা ইংরাজী নয়, লাতিন। অর্থ—যার একখানা মাত্র শিং।

তবে ইউনিকর্ণ যেমন খ্যাতির পেয়েছে তেমন বুঝি আর কারও ভাগ্যে জোটে না। পশ্চিমে রাজা-রাজরাদের বাড়ির ফটকে, সিংহাসনে; শিলমোহরে—অনেক কিছুতেই এই ইউনিকর্ণ-এর মূর্তি। সিংহের মতোই সম্মান তার। ইউনিকর্ণ অনেকের চোখে রীতিমত পবিত্র। আমাদের দেশে কারও কারও চোখে গরু যেমন। তাছাড়া ইউনিকর্ণ-এর শিং-এর নাকি অনেক গুন। সেকালে রাজাদের খাবার টেবিলে এক টুকরো ইউনিকর্ণ-এর শিং ফেলে রাখা হত। কারণ খাবারে কেউ বিষ মিশিয়ে দিলে দেখা যাবে শিংটুকু নিজে নিজে ঘেমে উঠেছে!

সুতরাং, সব রাজার এক হুকুম—শিং চাই। ইউনিকর্ণ-এর শিং। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে এত শিং? ইউনিকর্ণ মোটে দেখাই যায় না। দেখতে পেলেও তাকে ধরা নাকি খুবই শক্ত।

অনেক শিকারী এভাবে চেষ্টা করেও যখন ইউনিকর্ণ ধরতে পারছে না, কেবল হয়রানিই তাদের সার সার হচ্ছে তখন শোনা গেল অন্য কথা। পণ্ডিতেরা বললেন সেই যেবার বানের জলে পৃথিবী ভেসে যায় ইউনিকর্ণ তখন থেকেই আর পাওয়া যাচ্ছে না। আর সব জন্তু এখনও আছে। কারণ ভালোমানুষ নোয়া তাদের নিজের নৌকায় তুলে নিয়েছিলেন। ইউনিকর্ণও ছিল সে নৌকোয়। কিন্তু বেচারা জলে পড়ে যায়। তাই আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু সত্যিই এক শিংওয়ালা এ রকম কোনও প্রাণী ছিল কি কখনও? আজকের দিনে অনেকেই বলবেন—না, এসব আজগুবি গল্প মাত্র। এক শিংওয়ালা কোনও জন্তুই নেই, তা কিন্তু নয়। তোমরা সবাই জান—এক জাতীয় গণ্ডারের একটাই শিং। তাছাড়া সোর্ড-ফিস নামে এক ধরনের মাছ আছে। তার নাকের ডগায়ও তলোয়ারের মতো একটা শিং থাকে। তাই বলে গাধা কিংবা ঘোড়ার কপালে শিং? খবরটা গুজব বলেই মনে হয়। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, সেকালের লোকেরা ইচ্ছে করেই মিথ্যা বলেছিল। আসলে পারস্য দেশে মন্দিরের দেওয়ালেখোদাই করা ষাঁড়ের ছবি দেখেই নাকি ওরা কল্পনা করেছিলেন এক শিংওয়ালা এই প্রাণীর কথা। শিল্পীরা ষাঁড়গুলোকে এক পাশ থেকে দেখিয়েছিলেন বলেই শিং দেখানো হয়েছিল একখানা করে। এক পাশ থেকে মানুষ আঁকলেও কিন্তু একটা চোখ, একটা কান দেখা যায়। তাই নিয়ে এখন আর কেউ নিশ্চয় সোরগোল বাঁধায় না। সেকালে ওরা সবে নতুন নতুন দেশ, নতুন নতুন প্রাণী দেখছেন, এক শিং নিয়ে তাই এমন হল্লা।

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
ওই বস্তায় করে আকাশে উঠবে? বলো কী? আকাশে ওই বস্তাকে ভাসিয়ে রাখবে কে?
গরম বাতাস। কিন্তু, আলী, লোকগুলো খুব সুবিধের নয়, সেটাই হচ্ছে সমস্যা।
ওরা তো আর প্রকৃতিকে ভালবেসে এই জঙ্গলে আসেনি, এসেছে লুঠ করতে। নিজেদের স্বার্থে এখানকার শান্তি ওরা নষ্ট করতে চায়।
বেলুনের লোকগুলো হাতির দাঁত আর হাড়ের পাহাড়ের খোঁজ পেয়েছে। এই খবর যদি বাইরে গিয়ে পৌঁছয়, তাহলে আর দেখতে হবে না। দলে-দলে লোক এসে এই জঙ্গলের মধ্যে ভিড় জমাবে।
উইলি আর অবলিকিউরি তো দেখছি ইতিমধ্যেই উত্তেজিত।
ঠিক এইজন্যেই আমার ভয়। কী করে ঠেকাব জানি না। ঠেকাবার চেষ্টা করা উচিত হবে কিনা, তা-ই বা কে জানে।
সন্ধে হল। আমার বাড়িতে চলো। সেখানে দুজনে মিলে একটা যুক্তি করা যাবে।
পরদিন ভোরে...
EEEEEE!
ব্যাপার কী?
চিৎকার কিসের?
নদীর ধারে!
এ কী?
আমাদের বেলুন!
কী হয়েছে?
বেলুনের দড়ি কে কাটল?
একটা বেলুনে একজন মানুষ দেখছি!
ওই দ্যাখো! ওরাই পাহারা দিচ্ছিল!
কে নিখোঁজ?
লিনডা?
কোথায় লিনডা?
কেউ গিয়ে হোটেলে ওর খোঁজ নাও! এক্ষুনি!

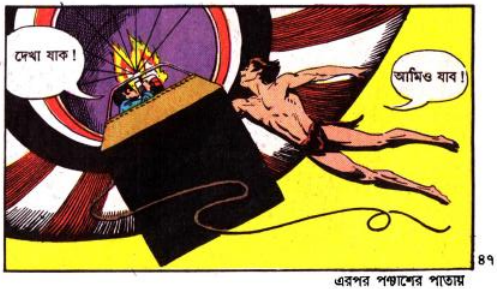

এরপর পঞ্চাশের পাতায়

[প্রাচীন গ্রিস এবং রোমের ধর্ম আজ আর কোথাও নেই। গ্রিকদের ধারণা ছিলো পৃথিবীটা সমতল আর চাকার মতো গোল। তার মাঝখানে আছে অলিম্পাস পাহাড়। সেখানে থাকেন দেবদেবীরা। আজকের দিনে পৃথিবীর কোনো মানুষ অলিম্পাস পাহাড়ের কোনো দেবদেবীকে পুজো করে না। কিন্তু সেই দেবদেবীদের মানুষ ভুলে যায়নি। প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্যে কাব্যে চিত্রে স্থাপত্যে সেই সব কাহিনী এত ছড়িয়ে রয়েছে যে, বলার নয়। বড় হয়ে নিশ্চয়ই একদিন না একদিন সেই সব কাব্য শিল্প তোমরা পড়বে, দেখবে।

গ্রিক পুরাণের একটি কাহিনী এখানে বললাম।]

মিনার্ভা ছিলেন জ্ঞানের দেবী এবং দেবরাজ জুপিটারের কন্যা। তাঁর জন্ম জুপিটারের মগজ থেকে। ছেলেদের কাজ চাষবাস করা আর নৌকো-জাহাজ চালানো। মেয়েদের কাজ সুতো কাটা, কাপড় বোনা আর পোশাক বানানো। ছেলেমেয়েদের এইসব শিল্পকাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন মিনার্ভা। যুদ্ধবিগ্রহেরও তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী —কিন্তু সেটা শুধু প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের ব্যাপারে। জুপিটারের পুত্র রণদেবতা মার্স্। মার্স্-এর প্রিয় ছিলো হিংসাত্মক রক্তাক্ত যুদ্ধবিগ্রহ। মিনার্ভা কিন্তু মোটেই তার পক্ষপাতী ছিলেন না।

মিনার্ভা থাকতেন এথেন্স নগরে। এই এথেন্স নগরের উপর লোভ ছিলো বরুণদেব নেপচুনেরও। দেবতারা স্থির করেন পৃথিবীর মানুষের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপহার তাঁদের দু'জনের মধ্যে যিনি দিতে পারবেন এথেন্স নগর হবে তাঁরই। ফলে মিনার্ভা আর নেপচুন এক প্রতিযোগিতায় নামেন। নেপচুন সৃষ্টি করেন ঘোড়া। মিনার্ভা সৃষ্টি করেন জলপাই গাছ। দেবতারা রায় দেন—এ-দুটির মধ্যে জলপাই গাছই পৃথিবীর মানুষের পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয় জিনিস। তাই তাঁরা এথেন্স নগর উপহার দেন মিনার্ভাকে। মিনার্ভার গ্রিক নাম এথেনা। তাঁর নামেই এই শহরের নামকরণ হয়—এথেন্স।

মিনার্ভার সঙ্গে আর একবার প্রতিযোগিতা করার দুঃসাহস করেছিলো পৃথিবীর একটি কুমারী মেয়ে। নাম তার আরাচ্নে। কাপড় বোনা আর ছুঁচের কারুকাজে তার ছিলো আশ্চর্য দক্ষতা। তার কাপড় বোনা আর ছুঁচের কাজ দেখার জন্য সমুদ্র পাহাড় ঝর্ণা থেকে ছুটে আসতো পরীর দল। আরাচ্নের বোনা কাপড় আর ছুঁচের কারুকাজ শুধু যে আশ্চর্য সুন্দর হোতো তাই নয়, তার কাজ করার ধরণও ছিলো চমৎকার। ভেড়ার লোম পিঁজে-পিঁজে মেঘের মতো হালকা আর নরম করে সে তুলতো, তারপর টাকু দিয়ে মিহি সুতো কেটে সেটা দিয়ে জালের মতো কাপড় বুনে তার উপর ছুঁচ দিয়ে তুলতো নানা আশ্চর্য নক্সা। যে দেখতো মুগ্ধ হয়ে সে-ই বলে উঠতো, নিশ্চয়ই এটা তাকে শিখিয়েছেন স্বয়ং মিনার্ভা।

লোকের মুখে-মুখে কথাটা শুনতে শুনতে ভীষণ বিরক্ত হয়ে আরাচ্নে একদিন বলে উঠলো, "কক্ষণো না। মিনার্ভা আমার মতো বুনন দিকিনি। তাঁর কাছে হারলে যে-কোনো শাস্তি মাথা পেতে নেবো।"

আরাচ্নের কথাটা কানে যেতে ভীষণ চটে উঠলেন মিনার্ভা। এক বুড়ির ছদ্মবেশে আরাচ্নের কাছে হাজির হয়ে তিনি বললেন, "দেখো বাছা! আমার অনেক বয়েস হয়েছে। তোমার চেয়ে অনেক বেশী জানিশুনি। তাই আমার উপদেশ শোনো। যে-কোনো মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কর—তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু দেবদেবীর সঙ্গে কক্ষণো প্রতিযোগিতা করতে যেয়ো না। আমার মনে হয় যা বলেছো তার জন্যে মিনার্ভার কাছে তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। তিনি দয়াময়ী। তোমাকে ক্ষমা করবেন।"

টাকু দিয়ে সুতো কাটা থামিয়ে বুড়ির দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে চড়া মেজাজে আরাচ্নে বললো, "ঠানদি, উপদেশ-টুপদেশগুলো তোমার নাতি-পুতি ঝি-চাকরানীদের দাও গে! যা বলেছি, ঠিকই বলেছি, একশ' বার বলবো। মিনার্ভাকে আমি ভয় করি না। সাহস থাকলে আমার সঙ্গে তিনি প্রতিযোগিতা করতে আসুন।"

আরাচ্নের কথা শুনে বুড়ির ছদ্মবেশ থেকে বেরিয়ে দেবীমূর্তি ধারণ করে মিনার্ভা বললেন, "বেশ, তবে তাই হোক!"

তাঁকে দেখে মানুষ আর পরীর দল সশ্রদ্ধভাবে নত হয়ে প্রণাম করলো। একমাত্র আরাচ্নেই ভয় পেলো না। শুধু মুহূর্তের জন্য তার সারা মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠে আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। কিন্তু নিজের সংকল্প থেকে বিন্দুমাত্র সে টললো না। বোকার মতো এগিয়ে গেলো নিজের নিষ্ঠুর নিয়তির দিকে।

কামাক্ষীপ্রসাদ

মিনার্ভা তাকে ক্ষমা করলেন না। আর কোনো উপদেশও দিলেন না।

সুরু হয়ে গেলো তাদের প্রতিযোগিতা। নানা রঙের পশম নিয়ে দ্রুত দক্ষ হাতে মিহি কাপড় বুনতে সুরু করলেন মিনার্ভা। আরাচনেও পিছিয়ে রইলো না। রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে দুজনেরই বোনা কাপড় হয়ে উঠলো রামধনুর মতো সুন্দর।

তারপর সুরু হোলো সেই কাপড়ে ছুঁচের কারুকাজ।

নেপচুনের সঙ্গে প্রতিযোগিতার নক্সা মিনার্ভা তুললেন তাঁর বোনা জালের মতো কাপড়ে। সেই নক্সায় ছিলো বারো জন দেবদেবীর ছবি। মাঝখানে দেবরাজ জুপিটার। বরুণদেব নেপচুনের হাতে ত্রিশূল। দেখলে মনে হয় সেই ত্রিশূল দিয়ে এইমাত্র পৃথিবীতে আঘাত হেনেছেন এবং সেখান থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসছে একটি ঘোড়া। মিনার্ভা নিজের চেহারার যে-নক্সা তুললেন তাতে তাঁর মাথায় ছিলো রানীর মুকুট। কাপড়ের মাঝখানের নক্সাটা এই। কাপড়ের চার কোণে ছিলো নানা ঘটনার ছবি। তাতে স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছিলো দেবদেবীর সঙ্গে মানুষের প্রতিযোগিতায় নামার হঠকারিতার পরিণামের কথা। এই সব নক্সা মিনার্ভা তুলেছিলেন—যাতে সময় থাকতে আরাচনে সাবধান হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকে।

আরাচনে কিন্তু মিনার্ভার ইঙ্গিত গ্রাহ্যই করলো না। সে তার নক্সায় ফুটিয়ে তুলতে লাগলো দেবদেবীদের নানা প্রতারণা ও দোষ-ত্রুটির কাহিনী। একটি দৃশ্যে দেখা গেলো দেবরাজ জুপিটার হাঁসের রূপ ধরে কি ভাবে লেডা নামে এক সুন্দরী মেয়েকে ছলনা করেছিলেন। একটি দৃশ্যে ফুটে উঠলো পিতলের এক মিনার, যেখানে দানাই-কে তার বাবা বন্দী করে রেখেছিলেন এবং সেখানে দেবরাজ জুপিটার প্রবেশ করেছিলেন স্বর্ণ-বৃষ্টির রূপ নিয়ে। একটি দৃশ্যে ছিলো ইউরোপা নামে এক সুন্দরী আর বৃষের ছদ্মবেশধারী জুপিটারের কাহিনী। ষাঁড়টির শান্ত-শিষ্ট চেহারায় প্রতারিত হয়ে ইউরোপা তার পিঠে চড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে জুপিটার তাকে নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে ইউরোপাকে সোজা নিয়ে আসেন ক্রেট নগরে। দেখলে মনে হয় ষাঁড়টি যেন বাস্তবিকই ষাঁড় আর সমুদ্রের জল যেন সত্যিকারের জল। সমুদ্রের বিরাট-বিরাট ঢেউ দেখে ইউরোপার চোখমুখের আতঙ্ক এমন নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছিলো যে, তাকালে সবকিছু জীবন্ত আর বাস্তব বলে মনে হয়।

এই ধরনের নানা দৃশ্য নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলো আরাচনে। কিন্তু প্রত্যেক দৃশ্যের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো তার উদ্ধত্য আর দেববিরোধী মনোভাব। আরাচনের কারুকাজ মনে মনে তারিফ না করে মিনার্ভা পারলেন না। কিন্তু এই অপমান তিনি পারলেন না বরদাস্ত করতে। নিজের কাপড় বোনার মাকু দিয়ে তিনি টুকরো-টুকরো করে দিলেন আরাচনের জালের মতো কাপড়টা। তারপর তিনি স্পর্শ করলেন আরাচনের কপাল—যাতে সে লজ্জা পায়, নিজের অপরাধ বুঝতে পারে।

আরাচনে তখন মনের দুঃখে গলায় দড়ি দিয়ে মরে। তাকে দড়িতে ঝুলতে দেখে মিনার্ভার করুণা হোলো। তিনি বলে উঠলেন, "মুখ্খু, উদ্ধত মেয়ে! তুমি বেঁচে থাকবে। যে-শিক্ষা দিলাম তার স্মৃতি চিরকাল বইবে তুমি আর তোমার বংশধররা—কারণ বেঁচে থাকলেও চিরকাল তোমাদের থাকতে হবে ঝুলে।"

এই না বলে কুচিলা গাছের বিষাক্ত রস তিনি ছিটিয়ে দিলেন আরাচনের সর্বাঙ্গে। আর সঙ্গে-সঙ্গে খসে গেলো তার চুল, তার নাক, তার কান। কুঁকড়ে শরীরটা তার ছোট্ট হয়ে গেলো। মাথাটা আরো ছোট্ট। আঙুলগুলো তার গায়ের সঙ্গে লেপটে হয়ে গেলো সরু সরু পা। এইভাবে আরাচনে আর তার বংশধররা মাকড়সা হয়ে গিয়ে ঝুলতে-ঝুলতে আজও জাল বুনে চলেছে।

চট্টোপাধ্যায় মাকড়সা

ছবি এঁকেছেন ॥ মদন সরকার

আচ্ছা কোরক, তোমার নামের অর্থটা কী? আর হ্যাঁ, ওই বেলুনে যে লিন্ডা আছে, এমন কথা তোমার মনে হচ্ছে কেন?
কোরক মানে কুঁড়ি। আমার ধারণা লিন্ডাকে ওই বেলুনে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
কেন? সে যাতে হাতির কঙ্কালের সেই পাহাড়ের নিশানা বলে দিতে বাধ্য হয়, সেইজন্য?
ঠিক বলেছ। কে তাকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে, তাও আমি অনুমান করতে পারি।
পাহাড়ী এলাকায় এসে পড়েছি। কিন্তু জায়গাটা তো চিনতে পারছি না। সেই কঙ্কালের ঢিপিই বা কোথায়?
লিনডার বেলুনটাই বা কোথায় গেল?
আরে টুপিটা উড়ে গেল যে...
ঝড় উঠেছে! হুঁশিয়ার!
শিগ্গির বেলুনটাকে নীচে নামাও!
চেষ্টা তো করছি, কিন্তু বাতাসের ঠেলায় পারছি না!
বেলুনটা ফেঁসে না যায়! কী সর্বনাশ!
নীচে নামছি... নীচে... নীচে...
মাটির উপরে আছড়ে না পড়ি!

এরপর আগামী সংখ্যায়

তোমাদের পাতা

ছেলেধরা

তোমরা সকলে বানানো গল্প শোন ও পড়, কিন্তু আজ আমি একটা সত্যি সত্যি গল্প শোনাব তোমাদের। অনেক-দিন আগে আমি একবার গ্রামে পিসীর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কিছু-দিনের মধ্যেই আমার অনেক বন্ধু হয়ে গেল। তাদের নাম—টুনটুনি, মুন্নি, বুলবুলি, রিনা। পিসীর বাড়ীর ঠিক পাশে একটা ধানকল ছিল। তার পাশে একটা ঘন জঙ্গল ছিল। অবশ্য আমরা যে জায়গাটায় খেলছিলাম, সেখানটা পাঁচিল দেওয়া ছিল, পাঁচিলের এপারটা আমাদের খেলার জায়গা আর ওপারটা জঙ্গল ছিল। কিন্তু আমরা যেদিকটায় খেলতাম ঠিক সেই দিকের পাঁচিলটা একটুখানি ভাঙা ছিল। ভাঙা পাঁচিলের গায়ে ছিল একটা লিচু গাছ। আমরা লিচু খাবার লোভে ওই দিকটা খেলতাম। আমরা যখন লুকোচুরি খেলতাম তখন আমাদের সকলেরই ইচ্ছে হত লিচু গাছের তলায় লুকোবার। কারণ লিচু গাছের তলায় যে লুকোতে পারবে সে তো লুকোতে পারবেই, তাছাড়া লিচুও খেতে পারবে। আমরা ঠিক করেছিলাম যে কোন একজন শুধু এ গাছের তলায় লুকোবে। কারণ লিচু গাছটা তো বেশি বড় ছিল না। তাই দুজন লুকোলেই ধরা পড়ে যাবে। এমনি একদিন বিকেল হব হব হচ্ছে, তখন আমরা লুকোচুরি খেলতে আরম্ভ করলাম। লুকোচুরি খেলা যেই আরম্ভ হ'ল টুনটুনি লিচু গাছটার দিকে ছুটে গেল। সেদিন মুন্নি চোর হয়েছিল। প্রথমেই চোর হতে কার ভাল লাগে। মুন্নি মুখ ভার করে একটা গাছে ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করলো। আমরাও লুকিয়ে পড়লাম অন্য জায়গায়। টুনটুনি তখন খুব আনন্দে লিচু খাচ্ছিল। হঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম যে লিচু গাছের দিকে যে পাঁচিলটা ভাঙা ছিল, সেদিক থেকে একটা লোক পাঁচিলের ওদিক থেকে আমাদের মাঠের দিকে লাফিয়ে পড়ল। লোকটার মুখ দেখে আমাদের ভীষণ ভয় হ'ল। তারপর আর আমরা লোকটাকে দেখতে পাইনি। বুলবুলি বললে—ও বোধ হয় ধানকলে কাজ করে। আমি বললাম—বাদ দে ওসব কথা, মুন্নি কাকে ছোঁয় দেখ। ততক্ষণে মুন্নি চোখ খুলে ফেলেছে। আমাদের সকলকে দেখতে পেয়ে গেছে। ছোটাছুটির পর কাকে যেন ছুঁয়েও দিয়েছে। আবার খেলা শুরু হবে। কিন্তু তখন টুনটুনিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমরা টুনটুনির নাম ধরে চিৎকার করতে লাগলাম, কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। হঠাৎ মুন্নি বলে উঠল, সেই লোকটা ছেলেধরা না তো? রিনা সব থেকে ছোট ছিল, তাই সে একথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমি বাড়ী যাব। আমাদেরও চিন্তা হল। তখন আবার আমরা চিৎকার করতে লাগলাম। এবারও কোন ফল হল না। আমরা ভাবতে লাগলাম বাড়ীতে কি বলবো। তারপর ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু বাড়ীর কাছে এসে মনে হল আবার একবার দেখে এলে ভালো হত। তাই আমরা আবার ফিরে গেলাম আমাদের খেলার মাঠে। ফিরে গিয়ে আগে আমরা লিচু গাছের তলায় দেখলাম। তারপর হঠাৎ ওকে দেখতে পেলাম। টুনটুনিকে তখন পাগলের মত দেখাচ্ছে। দেখলাম—টুনটুনি ইঁটের কুচি খাচ্ছে। তার মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। সেই লালায় জামা লাল হয়ে গেছে। তাই আমি বুলবুলি আর মুন্নি বললাম—এই তুই কি খাচ্ছিস? বাড়ী যাবি না? এই কথা শুনে টুনটুনি বলল—না বাড়ী যাব না। আর সে আমাদের দিকে বড় বড় ইঁট ছুঁড়তে লাগল। এই সময় এইদিক দিয়ে পিসীর পাশের বাড়ীর টিটু নামে একটা ছেলে যাচ্ছিল। আমরা তাকে ডেকে সব বলতে সে ছুটে গিয়ে টুনটুনির হাতটা ধরে ফেললো। এবার আমরা সকলে ধরা-ধরি করে টুনটুনিকে বাড়ীতে নিয়ে এলাম। বাড়ীর বাইরে থেকে পিসীকে ডাকতে, বেরিয়ে এসে পিসী সব শুনে টুনটুনিকে ধরে দারুণ জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—এই টুনটুনি, তুই কি খেয়েছিস? সঙ্গে সঙ্গে টুনটুনি অজ্ঞান হয়ে গেল। তখন পিসী কোলে তুলে নিল টুনটুনিকে। এবং পিসে-মশাইকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে গেল।

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—ওকে দুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে।

তাই শুনে আমাদের সকলের মন খারাপ হয়ে গেল। কারণ টুনটুনি আমাদের খেলার সঙ্গী ছিল।

তিনদিনের দিন টুনটুনিকে পিসীরা নিয়ে এল। ডাক্তারবাবু বারণ করে দিয়েছিলেন যে—ওকে সেই দিনের কথা যেন জিজ্ঞেস না করা হয়।

এরপর আমি ফিরে এসেছিলাম কলকাতা। তারপর বেশ কিছুদিন পরে আবার গিয়েছিলাম পিসীর বাড়ী। তখন টুনটুনি নিজের থেকেই যা বলেছিল তা শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল।

টুনটুনি বলেছিল, একটা লোক আমার পাশে এসে বসল আর কি একটা মিষ্টি খাওয়াল, তারপর আর কিছু জানি না।

এই কথা শুনে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে কোন লোক কোন কিছু দিলে আর খাব না, আর ওখানে আর খেলব না।

তারপর আমরা কলকাতায় এসে গেছি অনেকদিন হয়ে গেছে। এখনও চোখের সামনে যখনই টুনটুনির সেই পাগল চেহারার মুখটা ভেসে ওঠে তখনই আমার গায়ে কাঁটা দেয়।

মল্লারী চৌধুরী

শেয়াল ভায়ে

এক যে ছিল শেয়াল
তার হঠাৎ হল খেয়াল,
মামারবাড়ি যাওয়ার
গিয়ে চিংড়ি ভাজা খাওয়ার!
মামারবাড়ি গিয়ে যখন
মামা বলে সে ডাকে,
মামা তখন বেরিয়ে এসে
'হুলুম!' বলে হাঁকে;
সেই হাঁকটি শুনে সে যে
চম্পট দিল ভাই,
মামারবাড়ির সীমানায় তার আর
দেখা মেলে না তাই!

—সুস্মিতা ঘোষ

অভ্র রায়

হাতি দিয়ে হাতি ধরা

পোষ-মানা হাতি মাত্রেই তো মানুষের খুব বন্ধু। আপদে-বিপদে-প্রয়োজনে, সেই কবে থেকে মানুষের সমাজে হাতির ব্যবহার চলে আসছে। জঙ্গল থেকে বুনো হাতিকে ধরে এনে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে ভব্যসভ্য করে তোলার কত বিচিত্র পদ্ধতিও চলছে সেই সুদূর অতীত কাল থেকে।

ভাবলে অবাক হতে হয় না? এত বড় বিশাল যাদের চেহারা, গায়ের জোর যাদের এমন প্রচণ্ড, সেই দানব-তুল্য হাতিকে মানুষ কি করে এমন বশ করে ফেলেছে! যে কিনা, মুখ বুজে দিনের পর দিন নির্বিচারে মানুষের সব হুকুম তামিল করে যাচ্ছে। এমনকি, চিঁড়িয়াখানায় পুঁচকে এক মাহুতের নির্দেশে ছেলে বুড়ো জোয়ান সবাইকে শুঁড় তুলে লম্বা লম্বা স্যালুট ঠুকে চলেছে! অথচ জঙ্গলের মধ্যে যখন এই হাতির পাল গাছের ডালপালা ভেঙে মড়মড় করে একদল দৈত্যের মতো এগুতে থাকে, তখন অতি বড় শিকারীরও ভয়ে বুক শুকিয়ে ওঠে। বাঘ সিংহের মতো দুর্ধর্ষ প্রাণীরাও সরে যায় তাদের রাস্তা থেকে। কার সাধ্যি তখন বুক ফুলিয়ে সেখানে গিয়ে একবার দাঁড়ায়?

কিন্তু মানুষের অসাধ্য কী আছে? মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে ঠিক এই হাতির পালকে বন্দী করার অদ্ভুত সব কৌশল বার করে ফেলেছে মানুষ। এদের জ্যান্ত অবস্থায় ধরার সেই বিচিত্র কৌশলগুলো যেমন তাজ্জব তেমনি মজার। সবচেয়ে সহজ উপায়টা অবশ্য জঙ্গলের মধ্যে হাতিদের চলার পথ দেখে সেখানে দড়ির ফাঁদ পেতে রাখা। অথবা শিক্ষিত হাতির পিঠে চেপে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ঝপ্ করে বুনো হাতির গলায় ফাঁস পরিয়ে দেওয়া। কিন্তু এরকম করে হাতি ধরার সম্ভবনা বড় বেশি অনিশ্চিত। এবং এতে করে এক সঙ্গে বেশি হাতিও পাওয়া যায় না। ফলে এ পদ্ধতিটা এখন প্রায় বাতিল হয়ে গেছে।

আর একটা বহু ব্যবহৃত কৌশল হল, হাতিদের চলন পথে গর্ত খুঁড়ে সেটাকে ডালপালা দিয়ে ঢেকে ঢুকে আবার স্বাভাবিক রাস্তার মতো করে রাখা। কাজটা অবশ্য খুব নিপুণ হাতে করতে হয়। কারণ হাতিদের মনে একবার সন্দেহ হলে ও পথ তারা আর ভুলেও মাড়াবে না। কাজটা ঠিক ঠিক হলে, হাতির দল সেখানে পা দিতেই একেবারে প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাবে। হুড়মুড় করে গোটাকয় একেবারে নির্ঘাত কুপোকাত। আর হাতি গর্তে পড়লে তার মতো অসহায় আর কে আছে?

কিন্তু হাতিকে গর্তে ফেলে ধরবার এই পথটাও এখন ত্যাগ করা

হচ্ছে। এভাবেও খুব বেশি হাতি ধরা সম্ভব নয়। তাছাড়া যারা ধরা পড়ে, তাদের অনেকেই ভীষণ চোট পায়, সময় সময় দুই একটা মারাও যায়।

আজকাল যে কৌশলটি সবচেয়ে বিখ্যাত তার নাম 'অপারেশান খেদা' বা খেদাশিকার। যার সাহায্যে গোটা একটা বুনো হাতির পালকেই এক সঙ্গে বন্দী করা সম্ভব। পোষমানা হাতিরা এবং বিস্তর লোকজন মিলে বুনো হাতিদের জঙ্গল থেকে খেদিয়ে এনে ধরিয়ে দেয় বলে বোধ হয় এ প্রথার এমন নাম। তাছাড়া যে খোঁয়াড়টার মধ্যে এদের আটকানো হয় সেটারও প্রচলিত নাম খেদা। এই পদ্ধতিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রীতিমত হৈ হল্লা হাঁকডাক আর নানারকম আওয়াজ করে হাতিদের তাড়িয়ে এনে খেদায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আবার কখনো বা শিক্ষিত হাতিদের সাহায্যে ষড়যন্ত্র করে প্রায় নিঃসাড়ে কাজটা হাসিল করে ফেলা হয়।। স্বীকার করতে বাধা নেই, আমাদের বন্ধু হাতিরাই কিন্তু তখন হয়ে ওঠে ওদের নিজেদের সমাজের সবচেয়ে বড় শত্রু।

এ ব্যাপারে আগে তৈরি করে নেওয়া হয় একটা মস্ত বড়ো খোঁয়াড়। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দু তিন সারি শালের খুঁটি পুঁতে একটা জায়গাকে বেশ মজবুত করে ঘিরে ফেলা হয়। তারপর যথারীতি খোঁয়াড়টাকে গাছপালা লতাপাতা দিয়ে এমন ভাবে ঢেকে ফেলা হয় যেন এটা জঙ্গলেরই একটা অংশ।

খোঁয়াড় তৈরি হলে পরে, সেই শিক্ষিত হাতিদের ছেড়ে দেওয়া হয় জঙ্গলে। তারা ছদ্মবেশে বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে একটা বুনো হাতির পালের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বেশ কিছু সময় যায়, কখনো দুদিন তিনদিন। অনুপ্রবেশকারী সেই গুপ্তচর হাতিরা তাদের সঙ্গে খুব খাতির-টাতির জমিয়ে এক সময়ে আস্তে আস্তে গোটা দলটাকে নিয়ে খোঁয়াড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ব্যাস্ আর কোথায় যায় তারা! লুকিয়ে থাকা শিকারীরা তখন ঝপ করে দরজাটা দেয় বন্ধ করে।

আর সঙ্গে সঙ্গে সেকি হুলুস্থুল কাণ্ড। হাতির আর্তনাদ আর দাপাদাপিতে থরথর করে কাঁপতে থাকে জঙ্গল। পাখিরা চিৎকার করতে করতে চক্কর কাটে আকাশে, ছোটখাট জন্তু জানোয়ার যে যেদিকে পারে তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে পালায়।

চারদিক থেকে পাকা শিকারীরা তখন তাদের ঘিরে ধরে। একদিকে লম্বা ফাঁস লাগানো দড়ি—যাকে বলা হয় ল্যাসো, তাই দিয়ে একটার পর একটা হাতিকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে তারা। দুঃসাহসী কিছু মাহুত পোষা হাতির পিঠে চেপে সোজাসুজি ঘুরতে ঘুরতে পটাপট ফাঁস লাগানো দড়ি পরিয়ে ফেলে। খোঁয়াড়ের ওপর থেকেও দড়ি ছোঁড়ে লোকেরা। অবশেষে এক সময় প্রত্যেকটি হাতিকে বেশ শক্ত করে পায়ে দড়ি বেঁধে ফেলা হয়।

প্রথমটা ভীষণ ঘাবড়ে গেলেও পরে রাগে টং হয়ে যায় হাতিগুলো। এবং সেই ভাবে পড়ে থাকে দু তিন কি তারও বেশি দিন। কোন খাবারটাবারও খায় না—একেবারে টানা উপোস। পরে শিক্ষিত হাতিদের সাহায্যে একটা একটা করে বাইরে আনা হয় তাদের। বেয়াড়া দেখে কতকগুলোকে ছেড়েও দেওয়া হয়।

তারপর আস্তে আস্তে মানুষদের সহ্য করতে শেখে ওরা। মানুষের দেওয়া খাবারও খায়। তখন শুরু হয় তাদের মানুষের সমাজের উপযোগী নানা রকম শিক্ষার পালা। তা বেশ অনেকদিন লেগে যায় তাদের শিক্ষিত হয়ে উঠতে।

আজকাল অবশ্য বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন এক পদ্ধতিতেও ধরা হয় হাতিদের। তাতে ঝামেলা ঝক্কি অনেক কম। বন্দুকের গুলিতে বারুদের বদলে অজ্ঞান করার ওষুধ পুরে দিয়ে তাক করে একবার হাতির গায়ে লাগাতে পারলেই হয়ে গেল। প্রায় তিন চার ঘন্টার মতো অজ্ঞান হয়ে যাবে সে। তখন তাকে বেঁধে ফেলা আর কোন সমস্যাই নয়।

কিন্তু এইভাবেও দলছুট দু একটা হাতিকেই শুধু ধরা যায়। পুরো দলকে নয়। তাছাড়া হাতির শরীরে অনেক সময় ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়াও ঘটে।

ফলে শিক্ষিত হাতিদের সাহায্যে হাতি ধরার পদ্ধতিটাই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকরী।

অক্লান্ত কর্মী ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৮৪৪ সালে জন্ম, ১৮৯৮ সালে মৃত্যু। তাঁর এই চুয়ান্ন বছরের জীবন নানাদিকে ব্যাপ্ত—স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনে, রাজনীতিক্ষেত্রে, সাময়িকপত্র পরিচালনায়, সাহিত্যসেবায়। দ্বারকানাথের সাহস ও সত্যনিষ্ঠা অতুলনীয়।

একদিন দ্বারকানাথ বৈঠকখানার রাস্তায় একটা গলির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। অপেক্ষা করছেন একজন বন্ধুর জন্য। রাত দশটা বেজে গেছে।

একখানা গাড়ি এসে ওই গলির মুখে দাঁড়াল। দ্বারকানাথের চোখে পড়ল, একজন সাহেব গাড়ি থেকে নেমে গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল, সাহেব গাড়ি-ভাড়া দেননি। গাড়োয়ান সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে, ভাড়া চাইছে—সাহেব ভাড়া, সাহেব ভাড়া।

ভাড়া দেওয়া দূরের কথা, সাহেব মারমুখো হয়ে উঠলেন। গাড়োয়ানও নাছোড়। সে সাহেবের সঙ্গ ছাড়ে না। সাহেব তাড়া করলে পিছিয়ে যায়, কিন্তু সাহেবকে চোখের আড়াল করে না।

শেষপর্যন্ত দ্বারকানাথের সাহায্য চাইল গাড়োয়ান। দ্বারকানাথ বললেন—চল, সাহেবের নাম জিজ্ঞেস করি, বাড়ির নম্বর দেখি। কাল ওর নামে নালিশ করিস, আমি সাক্ষী দেব।

দ্বারকানাথ সাহেবের নাম জানতে চাইলেন। সাহেব নাম বললেন না উপরন্তু মারতে উঠলেন দ্বারকানাথকে। দ্বারকানাথ পিছিয়ে আসবার মানুষ নন। দুজনে খুব ঘুষোঘুষি চলল।

একেবারে সাহেবের বাড়ির সামনেই হচ্ছে ব্যাপারটা। বাড়ির ভেতর থেকে তিনচারজন সাহেব বেরিয়ে এলেন। তাঁদের মধ্যস্থতায় বিবাদ থেমে গেল, গাড়োয়ানের ভাড়া নিয়ে আর কোনও গোলমাল রইল না।

যাকে নিয়ে এত গোলমাল, মারামারি, সেই সাহেব তখন দ্বারকানাথের দিকে এগিয়ে এলেন। না, মারামারি করতে নয়, শেকহ্যান্ড করতে। একটা মধুর সমাপ্তি হলেই তো ভালো হয়।

কিন্তু তা হল না। দ্বারকানাথই হতে দিলেন না। বললেন—আমি তোমার মতো কাপুরুষের সঙ্গে শেকহ্যান্ড করি না।

ইন্দ্রমিত্র

কুমুর কীর্তি

সেদিন দুপুরে না-ঘুমিয়ে কুমু বাগানে মাটি খুঁড়ছিল একমনে। তার দাদা দেখতে পেয়ে ছুটে এল।

–কি করছিস রে কুমু? মাটি খুঁড়ে?

–ভুগভ্যো রেল বানাচ্ছি।

–তার মানে?

–আহা, ধেড়ে ছেলে ভুগভ্যো রেল জাননা? মাটির তলা দিয়ে রেল গাড়ি ছুটে চলে হস্ হস্। পৃথিবীর কত দেশে আছে। কলকাতাতেও হবে।

–তুই কি করে জানলিরে পাকা বুড়ি?

–জানি। বাবা বলেছে। ভুগভ্যো রেল হলে বাবাকে আর ভীড় ঠেলে ট্রামে বাসে উঠতে হবে না। রেলে চাপলেই হউস্ করে পৌঁছে দিয়ে যাবে স্টেশনে। রোজ কত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে বাবা। কি মজা হবে তখন। তাই না?

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

ANANDAMELA

দেড় টাকা

আনন্দমেলা